অবসরগ্রহণ ও পেনশনঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

ডঃ মুহাম্মাদ হাবিবুর রহমান*
ফাতেমা রেজিনা পারভীন**

সার-সংক্ষেপঃ যদিও বর্তমান প্রবন্ধে প্রধানতঃ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অবসর গ্রহণ ও পেনশন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে -তথাপি এ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে বাংলাদেশের সমাজের সঙ্গে আমেরিকান সমাজের তুলনাও করা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সরকারী বেসামরিক পর্যায়ের চাকরিজীবি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে প্রবন্ধকারদ্বয় তাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছেন। গবেষণায় দেখা যায় রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট যেমন পেনশন, গ্রাচুইটি ইত্যাদি যতই বেশি বা আশাব্যাঞ্জক হবে এবং চাকরি থেকে আয়কৃত অর্থ যতই বেশি সঞ্চয় থাকবে অবসরগ্রহণের প্রতি মনোভাব ততই কম-নেতিবাচক হবে। মানুষের প্রত্যাশিত আয়ু বৃদ্ধির ফলে বর্তমানে ৬০+ বয়সী অনেক লোকই যথেষ্ট কর্মক্ষম থাকছেন-অথচ বাংলাদেশে একটি নির্দিষ্ট বয়সে বাধ্যতামূলকভাবে অবসরগ্রহণ করতেই হয়। এভাবে অবসরপ্রাপ্ত বয়স্ক লোকদের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোকই যথেষ্ট কর্মক্ষম থাকা সত্ত্বেও তারা অবসরগ্রহণ করেন এবং জীবনের বাকি অংশ কারও কারও কাছে একঘেয়েমী এবং useless মনে হতে পারে। আমাদের মত বেকার সমস্যায় জর্জরিত সমাজে অবসরগ্রহণের বয়সসীমা বেশি বাড়ানোর সুযোগ সীমিত বিধায় অবসর গ্রহণের পর কর্মঠ বয়স্কদের জন্য নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র তৈরি করা, রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট বাড়িয়ে দেয়া এবং আকর্ষনীয় আর্থিক সুবিধে দিয়ে golden hand shake এর ব্যবস্থাসহ অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করলে অবসরগ্রহণে খুব কম লোকই মনঃকষ্ট অনুভব করবেন। উত্তরদাতাদের অনেকেই অবশ্য অবসরগ্রহণের বয়স সীমা কিছুটা বাড়িয়ে দেয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন। কিছুটা উদ্যোগ নেয়া সত্ত্বেও পেনশন প্রাপ্তির জটিলতা দূর হয়নি। অবসর গ্রহণের পরবর্তী মাস থেকেই যাতে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাপনায় অবসরগ্রহণকারীরা তাদের পেনশন-গ্রাচুইটি পেতে পারেন সে ব্যবস্থা নিশ্চিত না করলে প্রবীণ অবসরপ্রাপ্তদের দুশ্চিন্তা ও অনিশ্চয়তায় নিক্ষেপ করা হবে। পাশাপাশি তাদের জন্যও চিকিৎসা ও উৎসব ভাতা নিশ্চিত করা আশু জরুরী।

ভূমিকা

যাঁরা চাকরি করেন তাঁদেরকে এক সময়ে অবসরগ্রহণ করতে হয় বা তাঁরা অবসরগ্রহণ করেন। কোন ব্যক্তি অবসরগ্রহন করলে তিনি বা তাঁর মৃত্যুতে তাঁর পরিবার নিয়মানুযায়ী পেনশনসহ অন্যান্য রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট পান। যদিও আমাদের দেশ প্রধানতঃ কৃষি প্রধান এবং সে বিবেচনায় অধিকাংশ লোক (ব্যবসায়ীসহ) স্বনিয়োজিত পেশায় কর্মরত-তথাপি দেশের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোকই বিভিন্ন ধরণের সরকারী এবং অন্যান্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন। বস্তুতঃ চাকরিতে যোগদান এবং চাকুরী থেকে অবসরগ্রহণ একটি

---

* অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
** সহকারী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

নিত্যনৈমিত্তিক অথচ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। অবসরগ্রহণের ফলে ব্যক্তির জীবনে কি ঘটে, অবসরগ্রহণের প্রতি মনোভাব কেমন, পেনশন বা রিটায়ারমেন্ট বেনিফিটই বা কি, কিইবা তার পরিমাণ, প্রয়োজনের তুলনায় তা কতটা বেশি বা কম ইত্যকার প্রসঙ্গ জানা এবং বার্ধক্যে অবসরগ্রহণকারীদের জীবন কিভাবে আরও অর্থবহ এবং উপভোগ্য করে তোলা যায় সেটা নিয়ে যথেষ্ট চিন্তা ভাবনার অবকাশ রয়েছে।

বর্তমান প্রবন্ধে চাকরি থেকে অবসরগ্রহণ, পেনশন তথা রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট সর্ম্পকে আমাদের আলোচনা এবং ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সীমাবদ্ধ রেখেছি।[১] এ লক্ষ্যে প্রবন্ধের প্রথম অংশে অবসরগ্রহণের প্রকারভেদ, অবসরগ্রহণের ফলাফল বা প্রভাব এবং অবসরগ্রহণের প্রতি মনোভাব বিশ্লেষণ করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশে বর্তমান বাংলাদেশে বেসামরিক চাকুরির ক্ষেত্রে প্রচলিত বিভিন্ন ধরণের রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট-যেমন পেনশন, গ্রাচুইটি ইত্যাদির ওপর আলোকপাত করা ছাড়াও এ সবের প্রতি অবসরগ্রহণকারীসহ অন্যান্যদের মনোভাব ব্যাখ্যা করারও প্রয়াস পেয়েছি। প্রবন্ধটি রচনায় আমরা প্রধানতঃ লাইব্রেরী রিসার্চের ওপর নির্ভর করেছি। তদুপরি কতিপয় প্রাসঙ্গিক বিষয়ের প্রতি মনোভাব জানার জন্য আমাদের পরিচালিত জরিপের[২] তথ্যও কাজে লাগিয়েছি।

প্রথম অংশ

অবসরগ্রহণ

অবসরগ্রহণের বিভিন্ন সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে প্রাথমিক অর্থনৈতিক পেশা (primary economic occupation) এবং পেশাগত আচরণের (occupational behaviour) পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে অবসর জীবনে অভ্যস্ত হওয়ার প্রক্রিয়া এবং অর্থনৈতিকভাবে অনুৎপাদনশীল ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার নামই অবসরগ্রহণ যা সাধারনতঃ বার্ধক্যে সংঘটিত হয়।[৩]

অবসরগ্রহণের সাথে সাথে কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট ভূমিকা ও কাজ পরিত্যাগ করেন এবং অনেকটা অস্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থক ভূমিকায় (vague and ambiguous role) অবতীর্ণ হন। কর্ম জীবনে প্রধানতঃ প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ নির্দিষ্ট কাজে বা কর্মক্ষেত্রে বিচরণ করেন। অবসরগ্রহণের পর বার্ধক্যের শেষ বছরগুলো (১৫-২০ বছরের মত) তেমন কোন কাজ থাকেনা আর কাজ থাকলেও নানা কারণে সেভাবে কাজ করার মত অবস্থা থাকেনা। এ সময়ে সমাজে তাঁরা নবতর পরিচয়ে পরিচিত হন-তাদেরকে বলা হয় অবসরপ্রাপ্ত, অবসর গ্রহণকারী (retirees) অথবা পেনশনভূক্ত (pensioners)।

অবসরগ্রহণ বলতে আমরা যা বুঝি তা' পৃথিবীর অনেক সমাজেই এক বিরল ঘটনা। অধিকাংশ প্রাক-শিল্প সমাজে দেখা যায় কোন ব্যক্তি কাজ-কর্ম থেকে নিজকে বিরত রাখেন তখন যখন তার পক্ষে আর কাজ কর্ম করা মোটেই সম্ভব নয়। কৃষি-পূর্ব সমাজে অত্যন্ত দুর্বল এবং কাজ করতে অক্ষম হলেই কোন ব্যক্তি কাজ থেকে নিজকে গুটিয়ে নেন। তবে পৃথিবীর সব সমাজেই এবং সব যুগেই বয়োবৃদ্ধির প্রক্রিয়ায় একটি পর্যায়ে বার্ধক্যে সবাই অর্থনৈতিক কাজ কর্ম ক্রমশঃ কমিয়ে দেন। সব সমাজেই বয়স্করা একটা পর্যায়ে ক্রমশঃ ভারি কাজ বাদ দিয়ে হালকা কাজ করেন। কালাহারি মরুভূমির কুং বুশম্যানদের (Kung Bushmen of Kalahari Desert) মধ্যে দেখা যায় যে যখন কোন প্রবীণ ব্যক্তির পক্ষে আর তীর-বর্শা দিয়ে বড় কোন শিকার প্রাণীকে ধাওয়া করা সম্ভব নয় তখন তিনি ফাঁদ পেতে শিকার ধরতে শুরু করেন। ঐ সমাজে যত দিন সম্ভব তত দিন মহিলা প্রবীণরা ফলমূল সংগ্রহের কাজ করে চলেন।[৪] বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে পুরুষ ও মহিলা প্রবীণরা তাঁদের পক্ষে সম্ভব এমন কাজকর্মে নিজদের নিয়োজিত রাখেন। বলতে কি, তাহাদের অনেকেরই আমরণ কাজ করতে হয়। কৃষি পেশায় নিয়োজিতদের অবসরগ্রহণের তেমন কোন ফুরসৎ নেই।

অবসরগ্রহণের উদ্ভব

শিল্পায়িত সমাজেই অবসরগ্রহণের রেওয়াজ তৈরি হয় এবং একটি আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা হিসেবে তা (অবসরগ্রহণ) বিংশ শতাব্দীতে সকল শিল্প সমাজে ব্যাপকতা লাভ করে।[৫] নিম্নোক্ত উপাদান সমূহ অবসরগ্রহণ প্রথার উদ্ভব ঘটাতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

১. কৃষি এবং অন্যান্য স্বনিয়োজিত শারীরিক শ্রম ভিত্তিক পেশার পাশাপাশি বা তদস্থলে নগর ও শিল্প ভিত্তিক অকৃষিজ (Non agricultural) পেশার উদ্ভব ও বিকাশ;
২. শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রশিল্পের বিকাশ;
৩. সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা ও কোম্পানীতে আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভব ও বিকাশ।

অবসরগ্রহণ প্রথার উদ্ভব ও বিকাশ কে Push and Pull দিয়েও ব্যাখ্যা করা হয়েছে।[৬] নতুন প্রযুক্তি ব্যবহৃত হতে থাকলে পুরাতন প্রযুক্তিতে অভ্যস্ত প্রবীণেরা অনেকটা অচল ও অকেজো (obsolete) হয়ে যেতে থাকেন। সাধারণতঃ দেখা যায় প্রবীণের অনেকের তুলনায় নবীনরাই নতুন প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং চাকরির বাজারে এদের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। তদুপরি,

সব সমাজেই বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পেয়েছে-অর্থাৎ কাজের সুযোগ ক্রমশঃ সীমিত হয়ে এসেছে। এসব কারণ অবসরগ্রহণের জন্য প্রবীণদের ওপর চাপ (push) সৃষ্টি করে। অর্থাৎ প্রবীণদের অবসরগ্রহণে বাধ্য করা হয়- আর এ জন্যই একটা নির্দিষ্ট বয়সে (যেমন, ৫৭, ৬০ বা ৬৫) বাধ্যতামূলক অবসরগ্রহণ বা Mandatory Retirement এর প্রশ্ন উঠে।

বাধ্য করার পাশাপাশি অবসরগ্রহণকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য 'রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট' তথা পেনশন, গ্রাচুইটি ইত্যাদি সুযোগ সুবিধে সৃষ্টি করা হয়েছে যা কিনা একজন প্রবীণ কর্মচারীকে অবসরগ্রহণে উৎসাহিত করতে পারে। আকর্ষণীয় আর্থিক অনুদান দিয়ে নির্দিষ্ট বয়সের পূর্বেই অবসরগ্রহণের জন্য বিভিন্ন সমাজে Golden Hand Shake এর ব্যবস্থাও গৃহীত হয়েছে। অবসরগ্রহণের এসব কারণ কে Pull factor হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

শিল্পায়িত সমাজে অবসরপ্রাপ্ত বা অবসরগ্রহণকারী লোকের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ায় সমাজে অবসরপ্রাপ্তরা একটি উল্লেখযোগ্য সামাজিক গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে যারা গড়ে তুলেছেন এক নতুন সামাজিক পরিবেশ। এ সব সমাজে অবসরপ্রাপ্তদের জন্য বাণিজ্যিক সেবা-সংস্থা তৈরি হয়েছে যারা অবসরপ্রাপ্তদের জন্য বাড়ি নির্মাণ, ভ্রমণ ব্যবস্থা, ক্রেতা হিসেবে Senior Citizen দের জন্য বিশেষ discount এর ব্যবস্থা ইত্যাদি প্রবর্তন করেছে। তদুপরি, শিল্পায়িত সমাজে প্রবীণদের সমস্যা লাঘবে এবং তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন সংঘ-সমিতি গড়ে উঠেছে।[৭] এসব ঘটনা অবসর জীবনের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব তৈরিতে এবং অবসরকে সহজে গ্রহণ করার মনোবৃত্তি গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

অবসরগ্রহণের প্রকারভেদ

বাধ্যতামূলক অবসরগ্রহণ (Mandatory Retirement)

একটি নির্দিষ্ট বয়সে অবসরগ্রহণে বাধ্য করার বিধানের নামই বাধ্যতামূলক অবসরগ্রহণ (Mandatory, Compulsory or forced retirement)। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তির ইচ্ছা অনিচ্ছার বিষয় বিবেচনা করা হয় না; তিনি অবসর চানকি চাননা সেটাও বিবেচ্য নয়। কোন সমাজে ৬৫ বছর বয়সে যদি বাধ্যতামূলক অবসরগ্রহণ রীতি থাকে তবে সেখানে কোন ব্যক্তি ৬৫ বছর বয়স অতিক্রম করার পর তিনি যতই সুস্বাস্থ্য এবং দক্ষতার অধিকারী হন না কেন, তাকে অবসরগ্রহণ করতেই হবে। এমনকি, তিনি যদি ৩৫ বছর বয়সীর চেয়েও অধিক কর্মঠ হন

তবুও তাকে অবসরগ্রহণ করতে হবে। বাধ্যতামূলক অবসরগ্রহণের পক্ষে যুক্তি হলোঃ এ ক্ষেত্রে সবাই একই বয়সে অবসরগ্রহণ করছেন যা একধরণের সাম্য বা সমতার ইঙ্গিতবহ। তাছাড়া 'মনে করা হয়' যে প্রবীণরা নবীনের মত অতটা উৎপাদনক্ষম ((Productive) নন। তদুপরি, বেকারত্বের কথা বিবেচনায় আনলে বয়সের একটি পর্যায়ে বাধ্যতামূলক অবসরগ্রহণ অতীব জরুরী বটে। তবে এর বিপক্ষে যুক্তি দিয়ে বলা হয়েছে যে দক্ষতা বা উৎপাদন ক্ষমতার মাপকাঠি কেবল বয়স নয়। অন্ততঃ কিছু প্রবীণ কিছু নবীনের চেয়েও অধিক দক্ষ ও কর্মঠ হতেই পারেন এবং এ ধরণের একজন প্রবীণ (৬৫+) যিনি নবীনের তুলনায় অধিকতর দক্ষ, পারদর্শী ও কর্মঠ ব্যক্তির জন্য বাধ্যতামূলক অবসরগ্রহণ কি ন্যায় সঙ্গত?

১৯৩৫ সালে Social Security Act অনুযায়ী আমেরিকান সমাজে বাধ্যতামূলক অবসরগ্রহণের বয়স ছিল ৬৫ বছর। চাকরির ক্ষেত্রে বয়স ভিত্তিক বৈষম্য দূর করে ১৯৭৮ সালে বাধ্যতামূলক অবসরগ্রহণের বয়সসীমা ৭০ বছরে উন্নীত করা হয়। ১৯৮৬ সালের পর বাধ্যতামূলক অবসরগ্রহণের ৭০ বছর বয়স সীমাও তুলে দেয়া হয়েছে।[৮]

ব্রিটেনে সরকারী চাকরি থেকে অবসরগ্রহণের বয়স সীমা পুরুষের জন্য ৬৫ বছর-অথচ মহিলাদের ক্ষেত্রে তা ৬০ বছর।[৯]

বাংলাদেশের সমাজেও বাধ্যতামূলক অবসরগ্রহণের বিধান রয়েছে। বিধান অনুযায়ী সরকারী কর্মচারীর চাকরির পঁচিশ বছর পুর্তির পর সরকার জনস্বার্থে প্রয়োজন মনে করলে যে কোন সময় কোন প্রকার কারণ না দর্শিয়ে যে কোন কর্মচারীকে বাধ্যতামূলক অবসর দিতে পারেন যা সরকারী চাকরিজীবির ক্ষেত্রে একটা বড় ধরণের টেনশনের কারণ। এছাড়া ৫৭ বছর বয়স পুর্তিতে বাংলাদেশের সরকারী চাকরিজীবিকে বাধ্যতামূলক ভাবে অবসরগ্রহণ করতে হয়। যেহেতু বাধ্যতামূলক অবসরগ্রহণ জনস্বার্থে কার্যকর করা হয় তাই এক্ষেত্রে অবসরগ্রহণের পর কোন ব্যক্তি পেনশনারী বেনিফিট প্রাপ্ত হবেন এবং ছুটি পাওনা সাপেক্ষে এল,পি, আর পাবেন।[১০] কিছু স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান যেমন-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির বয়স সীমা ৬০ বছর এবং বিশেষ প্রয়োজন ও ব্যবস্থায় তা শিক্ষকদের জন্য ৬৫ বছর। সরকারী চাকরি থেকে অবসরগ্রহণের বর্তমান বয়সসীমা সর্ম্পকে পরিচালিত এক মতামত জরিপে দেখা যায় যে অধিকাংশ উত্তরদাতাই (৮৬%) সরকারী চাকরি থেকে অবসরগ্রহণের বয়স সীমা ৫৭ থেকে ৬০ বৎসরে উন্নীত করা উচিত বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন। ৮% উত্তরদাতা

সরকারী চাকরি থেকে অবসরগ্রহণের বয়সসীমা ৬৫ তে উন্নীত করার পক্ষে মতামত দিয়েছেন।

যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে চাকরি থেকে অবসরগ্রহণের বয়স সীমা ৬০ বৎসর সে ক্ষেত্রে ৮৪% উত্তরদাতা মনে করেন তা ঠিক আছে। পক্ষান্তরে, ১৬% উত্তরদাতা এসব প্রতিষ্ঠানে চাকরির বয়স বৃদ্ধি করে ৬৫ বৎসর করা যেতে পারে বলে মতামত দিয়েছেন।

সরকারী চাকরি থেকে অবসরগ্রহণের বর্তমান বয়স সীমা সম্পর্কে আমরা ২৩৯ জন শিক্ষার্থীর মতামতও জরিপ করেছি যাদের বয়স ১৮ থেকে ২২ বছরের মধ্যে। এক্ষেত্রে ৭৯.০৮% (১৮৯ জন) উত্তর দাতা সরকারী চাকরি থেকে অবসরগ্রহণের বর্তমান বয়স সীমা ঠিক আছে বলে মনে করেন বরং বাংলাদেশের ব্যাপক বেকার সমস্যার কথা চিন্তা করলে তা যথাযথ এবং প্রয়োজনে এ বয়স সীমা কমিয়ে আনা যায় বলেও তারা মনে করেন। অন্যদিকে ২০.৯২% (৫০ জন) উত্তর দাতা মনে করেন সরকারী চাকরির বয়স সীমা বৃদ্ধি করা উচিৎ এবং তা ৬০ বছরে উন্নীত করা যায়।

ঐচ্ছিক বা স্বতঃ প্রবৃত্ত অবসরগ্রহণ (Flexible or Voluntary Retirement)

যে কোন বয়সে চাকরি থেকে অবসরগ্রহণের বিধানই হলো ঐচ্ছিক অবসরগ্রহণ। ঐচ্ছিক অবসরগ্রহণ নির্দিষ্ট বয়সসীমার মধ্যে অথবা যে কোন বয়সে হতে পারে। যেমন, বাধ্যতামূলক অবসরগ্রহণের বয়স যদি হয় ৬০ সেক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি ৬০ বছর বয়সের পূর্বে যে কোন সময়ে অবসরগ্রহণ করতে পারেন। আবার যদি কোন সমাজে বাধ্যতামূলক বয়স সীমা না থাকে তবে কোন ব্যক্তি যে কোন বয়সে অবসরগ্রহণের সুযোগ পেলে সেটাও হবে, এক ধরণের ঐচ্ছিক অবসরগ্রহণ।

ঐচ্ছিক অবসরগ্রহণে ব্যক্তির ইচ্ছা ও স্বাধীনতার ওপর বেশ গুরুত্ব দেয়া হয়। এতে কোন ব্যক্তির কাছে কোন বিশেষ কর্মক্ষেত্র ভাল মনে না হলে বা আর্থিকভাবে তেমন লাভজনক মনে না হলে তিনি স্বেচ্ছায় তা ত্যাগ করে অন্যত্র কাজে যোগ দিতে পারেন। তবে এতে নিয়োগকারী সংস্থা অনেক সময় তাদের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত, অভিজ্ঞ ও দক্ষ লোক হারাতে পারেন।

আমাদের সমাজে সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ঐচ্ছিক অবসরগ্রহণের সুযোগ রয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে নিয়ম হলো যিনি যে তারিখে অবসরগ্রহণ করবেন তিনি ঐ তারিখের কমপক্ষে ত্রিশ দিন পূর্বে নিয়োগ কর্তাকে এ বিষয়ে তাঁর ইচ্ছার কথা অবহিত করবেন। তবে অবসরগ্রহণের ইচ্ছার কথা নিয়োগ কর্তাকে নোটিশ দিয়ে জানিয়ে দিলে সেটাই চুড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে এবং এ ইচ্ছা প্রত্যাহার বা

সংশোধন করা যাবে না। অতএব দেখা যাচ্ছে ঐচ্ছিক অবসরগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করে একমাস পূর্বে নোটিশ দিলে তা (অবসরগ্রহণ) অবশ্য কার্যকর হয়ে যাবে। এখানে পূনরায় বিবেচনার কোন সুযোগ নেই।[১১] আমরা মনে করি এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে দ্বিতীয়বার চিন্তা করার জন্য দু'সপ্তাহ্ সময় দেয়া উচিৎ। কেননা, এতে অনেক সময় সরকারী প্রতিষ্ঠান একজন দক্ষ, অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত লোককে হারাতে পারে। অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী তার সিদ্ধান্তকে পুনরায় ভেবে দেখার সুযোগ পেতে পারেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি থেকেও স্বেচ্ছায় অবসরগ্রহণের বিধান রয়েছে।

আরলী রিটায়ারমেন্ট (Early Retirement)

ঐচ্ছিক অবসরগ্রহণ কে উৎসাহিত করতে কোন কোন দেশের সরকারী বা বেসরকারী সংস্থা বিশেষ আর্থিক সুবিধে প্রদান করতে পারেন এবং করেন। এ অবস্থায় কোন ব্যক্তি যদি নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই অবসরগ্রহণ করেন তবে তাকে আরলী রিটায়ারমেন্ট বলা হয়। আমেরিকান সমাজে এটা "Golden Hand Shake", "Open Window" ইত্যাদি নামে পরিচিত। আমেরিকান সমাজে ৬৫ বছরের পূর্বে স্বেচ্ছায় অবসরগ্রহণকে Early Retirement নামে আখ্যা দেয়া হয়।[১২]কোন সংস্থা যদি দেখে যে নতুন প্রযুক্তিতে দক্ষ যুব বয়সীদের অপেক্ষাকৃত কম বেতনে নিয়োগ করা যায় তখন সে সংস্থা আকর্ষণীয় আর্থিক সুবিধে দিয়ে তাদের সংস্থায় কর্মরত মাঝ-বয়সীদের অবসরগ্রহণে উৎসাহিত করেন, এবং তদস্থলে নতুনদের নিয়োগ করেন। যারা আর্থিক সুবিধে নিয়ে আগে ভাগে (early) অবসর নেন তারা অন্যত্র কাজ নেন অথবা ব্যবসা বাণিজ্যে যোগ দেন। আমাদের সমাজে বেকারত্বের কথা বিবেচনায় রেখে একবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে Golden Hand Shake এর উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবসরগ্রহণের ক্ষেত্রে এ ধরণের কোন রেওয়াজ নেই। এ ধরণের অবসরগ্রহণের পক্ষে এবং বিপক্ষে যুক্তি রয়েছে। বেকারত্ব দূর করা, সম্ভাবনাময়, উৎসাহী এবং আধুনিক প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত নবীনদের কাজ দেয়া-এ সবই হলো এ ব্যবস্থার ভাল দিক। এমন কি, মাঝ-বয়সী লোককে অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধে দিয়ে অবসরগ্রহণে উৎসাহিত করলে সেটা কোন কোন মাঝ-বয়সীর জন্য সুবিধে জনক ব্যবস্থাই মনে হতে পারে। কেননা, তাঁদেরকে প্রদেয় বিশেষ আর্থিক সুবিধে ব্যবসায় বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি করে এবং এভাবে অবসর নেয়ার পর অন্যত্র কাজও পাওয়া যেতে পারে যদিও আমাদের সমাজে এমন সুযোগ খুবই সীমিত। অন্যদিকে যে সংস্থা অতিরিক্ত আর্থিক সুযোগ

দিয়ে তাদের এতদিনের অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে অবসরগ্রহণে উৎসাহিত করে সে সংস্থা Cost Benefit Study তে ভুল করলে সংস্থার জন্য তা হবে খুবই ক্ষতিকর।

আমাদের পরিচালিত মতামত জরিপের ৬৮% উত্তরদাতা দেশের বেকারত্বের কথা চিন্তা করে মনে করেন যে কাউকে বাধ্য না করে ২৫ বছর পর নিয়মিত পেনশন-গ্রাচুইটি ইত্যাদি সুযোগ সহ অতিরিক্ত আকর্ষনীয় আর্থিক অনুদান দিয়ে চাকরি থেকে অবসরগ্রহণে উৎসাহিত করা যেতে পারে। পক্ষান্তরে ৩২% উত্তরদাতা এক্ষেত্রে দ্বিমত পোষণ করেছেন।

শাস্তিমূলক অবসর প্রদান (Retirement as Penal Measure)

বাংলাদেশে সরকারী কর্মচারী বিধিমালা অনুযায়ী নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ অথবা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের উর্ধতন কর্তৃপক্ষ কোন সরকারী কর্মচারীকে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ হিসেবে চাকরি থেকে অবসর দিতে পারেন। সাধারণতঃ অদক্ষতা, অসদাচরণ, দুর্নীতি এবং নাশকতামূলক অপরাধের জন্য শাস্তিমূলক অবসর প্রদান করার বিধান রয়েছে।[১৩] আমাদের সমাজের বর্তমান প্রেক্ষাপটে এ ধরণের শাস্তিমূলক অবসর প্রদানের বিধানের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। অবশ্য এ বিধানটির প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা না থাকলেই ভাল হত। তবে এ ক্ষেত্রে যাতে কোন ব্যক্তি কর্তৃপক্ষীয় অহেতুক রোষানলের শিকার না হন সেটা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

নৈতিক বিপর্যয়, অদক্ষতা, চাকরির নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গ ইত্যাদির কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে তদন্তে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়া হয় এবং বিশেষ ট্রাইবুনালে বিষয়টি বিচার করা হয়। সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে চাকরি থেকে dismiss করা হয়। এ ক্ষেত্রে সিন্ডিকেট স্থির করবে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক পেনশন পাবেন কিনা ।[১৪]

অক্ষমতা জনিত অবসর (Retirement Due to Incapacitation)

বাংলাদেশের কোন সরকারী কর্মচারি শারীরিক বা মানসিক অসুস্থতার জন্য সরকারী কর্ম সম্পাদনে স্থায়ী ভাবে অক্ষম হলে এ ধরণের অবসরগ্রহণের জন্য আবেদন করতে পারেন। আবেদন পত্রের সঙ্গে অসমর্থতা প্রমাণের জন্য যথারীতি মেডিক্যাল সার্টিফিকেট প্রদান করতে হয়।[১৫] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও শারীরিক ও মানসিক অসামর্থের কারণে কেউ চাকরি থেকে যে কোন সময় অবসর নিতে পারেন এবং যথারীতি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি পেনশন, গ্রাচুইটি ইত্যাদি লাভ করবেন।[১৬]

অবসরগ্রহণের ফলাফল বা প্রভাব (Consequences of Retirement)

কারও কারও কাছে অবসর জীবন এক ঘেয়েমী পূর্ণ এবং অর্থহীন মনে হতে পারে। যে সমাজে কোন ব্যক্তি কাজ বা ভূমিকা পালনের মাধ্যমে সমাজকাঠামোর সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে সে সমাজে কাজ না থাকলে সমাজ থেকে সে অনেকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

কাজ (work) কেবল মাত্র আমাদের মৌলিক প্রয়োজন মেটাতে অর্থ বা টাকা পয়সা এনে দেয়না। বস্তুতঃ কর্মই জীবন। কর্মহীন জীবনের কি কোন অর্থ থাকে? ফ্রয়েডের (Freud) মতে কর্ম আমাদের কে বাস্তবতা সর্ম্পকে জ্ঞান দান করেঃ এলটন মেয়ো (Elton Meyo) বলেন, কাজ আমাদেরকে সমাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত রাখে; মার্কস (Marx) বলেন, কাজের প্রাথমিক লক্ষ্য অর্থনীতি; ধর্মতত্ত্ববিদরা (Theologians) কাজের নৈতিক দিক সর্ম্পকে আগ্রহ দেখান; সমাজবিজ্ঞানীরা কাজকে সামাজিক মর্যাদা নির্ধারনের মাপকাঠি হিসাবে গুরুত্ব দেন; কতিপয় সমালোচকের মতে কাজ হলো দীর্ঘ সময়কে পরিপূর্ণ করে রাখার এক উত্তম ব্যবস্থা।[১৭]

অনেকের মতেই অবসরগ্রহণ হলো অনুৎপাদনশীলতার প্রতীক এবং তা (অবসরগ্রহণ) অপ্রয়োজনীয় বা উপযোগীতা হীন।

সারা জীবন আমরা কাজ এবং কাজের ফলে অর্জিত সব ধরনের সাফল্য, কাজের ফসল, দক্ষতা, উন্নয়ন ইত্যাদিকে গুরুত্ব দেই- আবার বার্ধক্যে আমরা অবসরগ্রহণ করতে চাই- এটা এক ধরণের স্ববিরোধ পূর্ণ আচরণ নয় কি?

যখন আমরা কাউকে জিজ্ঞাসা করি আপনি কি করেন? উত্তরে কেউ বলেন আমি শিক্ষক; কেউ বলেন, আমি আইন জীবি, কেউ বলেন আমি ডাক্তার, অন্য কেউ বলেন আমি মিস্ত্রী ইত্যাদি। কিন্তু অবসরগ্রহণকারী ব্যক্তি সমাজে এ জাতীয় প্রশ্নের উত্তরে পরিচয় দেবার মত তেমন কিছু বলতে পারেন না। তাঁর মধ্যে পরিচিতি সংকট (identity crisis) এবং আত্ম উপলব্ধিহীনতা দেখা দেয়। অতএব, এ কথা বলাই বাহুল্য যে অবসর গ্রহণকারীদের জন্য যদি কোন অর্থপূর্ণ সামাজিক ভূমিকা তৈরি করা না যায় তবে এর ফলে তাদের মধ্যে হতাশা এবং বিচ্ছিন্নতা-বোধ জন্ম নিতে পারে।[১৮]

বস্তুতঃ চাকরি থেকে অবসরপ্রাপ্তদের যদি অর্থপূর্ণ সামাজিক ভূমিকায় re-engage করা না যায় তা হলে তার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে।[১৯] উপরোক্ত আলোচনার মধ্যে অবসরগ্রহণের একটা বিষন্ন চিত্র (gloomy Picture) ফুটে ওঠে এবং তা আপাতঃ দৃষ্টিতে যুক্তি সংগত বলেই

মনে হয়। কিন্তু অবসরগ্রহণের এ নেতিবাচক তথা হতাশাব্যঞ্জক চিত্র কতটা সঠিক? যারা মনে করেন অবসর জীবনের দিনগুলো "সোনালী দিন" (golden years) তারা অবসর জীবনের জটিলতা ও সমস্যাগুলো উপেক্ষা করেন এবং ভুলে যান যে অবসর কাউকে এমন সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক আঘাত দিতে পারে যা দীর্ঘদিন ধরে কারও কষ্ট ও বেদনার কারণ হতে পারে।

তবে অবসরগ্রহণের প্রতি মনোভাব এবং অবসর জীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর ওপর আমেরিকান সমাজে পরিচালিত গবেষণায় লক্ষ্য করা গিয়েছে অনেকেই অবসরগ্রহণকে সহজে গ্রহণ এবং অনেকেই তা বেশ আনন্দ চিত্তেই মেনে নেন।

বাংলাদেশে প্রবীণ পুরুষ ও মহিলাদের ওপর পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, বার্ধক্যে পুরুষের তুলনায় মহিলারা পরিবার ও সমাজের সঙ্গে অধিকতর কার্যকরভাবে খাপখাইয়ে নিতে সক্ষম।[২০] বস্তুতঃ অবসর জীবনের তৃপ্তির শর্ত হলঃ সুস্বাস্থ্য এবং আর্থিক নিরাপত্তা। উপরোক্ত শর্ত পূরণ হলে 'পরিচিতি সংকট' (identity crisis) তৃপ্তিদায়ক জীবনের পথে তেমন অন্তরায় হয়ে দাড়ায় না।

অবসরগ্রহণের প্রভাবঃ বিশ্বাস ও বাস্তবতা

নিম্নোক্ত বিষয়ের ওপর অবসরগ্রহণের প্রভাব সর্ম্পকে সৃষ্ট কল্পনা (বিশ্বাস) এবং বাস্তবতা ব্যাখ্যা করা হলো।

দৈহিক স্বাস্থ্য ঃ এটি একটি জনপ্রিয় বিশ্বাস যে অবসরগ্রহণের ফলে শরীর ভেঙ্গে পড়ে। এমনকি, কখনও বা তা কারও কারও জন্য আগে ভাগে মৃত্যু ডেকে আনে। অনেকেই বিশ্বাস করেন, যারা দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করেন তারা অবসরগ্রহণ করলে কয়েক মাসের মধ্যেই অকস্যাৎ মৃত্যুবরণ করেন।.

আমেরিকায় পরিচালিত গবেষনায় দেখা গিয়েছে যে অবসরগ্রহণ শারীরিক স্বাস্থ্যের ওপর কোন ক্ষতিকর প্রভাব রাখেনা। বরং অবসরগ্রহণের পর অনেকের শারীরিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে। এ কথা ঠিক যে অবসরপ্রাপ্তদের অনেকেই শারীরিক ভাবে অসুস্থ্য-তবে তা অবসরগ্রহণের কারণে নয়। বরং অনেকেই অসুস্থ্য বিধায় অবসরগ্রহণ করেন।[২১] ঢাকা শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্ষুদ্র একটি অংশের মধ্যে পরিচালিত মতামত জরিপে দেখা যায় যে ৮৭% উত্তরদাতাই মনে করেন চাকরি থেকে অবসর নিলে শারীরিক স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে।

বস্তুতঃ আমাদের দেশে চাকরির অভাব, স্বল্পবেতন, মুদ্রাস্ফিতির হার, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর মূল্যের উর্ধ্বগতি, মৌলিক চাহিদা পূরণের অক্ষমতা

ইত্যাদি অবসর জীবনে বিরুপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে যার ফলে ব্যক্তি শারীরিক (ও মানসিকভাবে) অসুস্থ হয়ে পড়ে।

মানসিক স্বাস্থ্যঃ যেহেতু প্রায়ই মনে করা হয় যে কাজের মধ্যে থাকলে মন ভাল থাকে; অথবা বিশ্বাস করা হয় যে কাজের একটি রোগ আরোগ্য মূল্য (therapeutic value) রয়েছে-সেহেতু কাজ না থাকলে (অর্থাৎ অবসরগ্রহণ করলে) মানসিক অসুস্থ্যতা দেখা দিতে পারে। আসলে, চাকরি জীবনে কাজের মাঝে থাকা অবস্থায়ও অনেকেরই মানসিক সমস্যা থাকে যা অবসরগ্রহণের পর উপেক্ষা করা হয় এবং মনে করা হয় যে অবসরগ্রহণের ফলেই বুঝি বা মানসিক স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছে। যা হোক আমেরিকান সমাজে পরিচালিত গবেষণার তথ্য দ্বারা উপরোক্ত বিশ্বাস (মানসিক ভাবে অসুস্থ হবার বিশ্বাস) তেমন সমর্থিত হয়নি।[২২]

পক্ষান্তরে, বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত সমাজের একটি অংশের ওপর পরিচালিত গবেষণায় দেখা যায় যে ১০০% উত্তরদাতাই চাকুরি থেকে অবসরগ্রহণ মানসিক অসুস্থতা সৃষ্টি করে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন। বস্তুতঃ আমাদের সমাজে কর্মক্ষেত্র খুবই সীমিত এবং চাকুরি থেকে অর্জিত অর্থ প্রয়োজনের তুলনায় এতই নগন্য যে তা থেকে অর্থ সঞ্চয় করে রাখা প্রায় অসম্ভব কাজ। এজন্য অনেকেই অবসরগ্রহণকে সহজে মেনে নিতে পারে না। ফলে সংসার জীবনের বিভিন্ন দায়দায়িত্ব (সন্তানদের পড়াশোনা, বিবাহ), নানাবিধ আশা নিরাশা ও ব্যর্থতার দ্বন্দ্বগুলো জমা হয়ে মানসিক চাপ সৃষ্টি করে।

আয় ঃ একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে অবসরগ্রহণ করলে অধিকাংশ লোকেরই আয় কমে যায়। গড়পরতা হিসেবে অর্ধেক বা দুই তৃতীয়াংশ আয় কমে যায়। অবসর জীবনে পর্যাপ্ত আয় থাকলে অথবা প্রয়োজনীয় আর্থিক নিরাপত্তা সহ অবসরগ্রহণ করলে তৃপ্তি পাওয়া যায়।[২৩]

ঢাকা নগরে পরিচালিত মতামত জরিপে দেখা যায় যে ৯৮% উত্তরদাতাই অবসরগ্রহণের ফলে ব্যক্তির আয় হ্রাস পায় এ ধরণের মতামত দিয়েছেন। তাঁরা আরও উল্লেখ করেছেন যে অবসরগ্রহণে ব্যক্তির মর্যাদা এবং ক্ষমতা বেশ খানিকটা হ্রাস পায়। পরিবারে তাদের পূর্বের ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে পরিবার পরিজনের ওপর আর্থিক নির্ভরতা বৃদ্ধি। প্রবীণ জীবনের ওপর পরিচালিত আমাদের আরেকটি গবেষণায়ও এ ধরণের তথ্য পাওয়া গিয়েছে।[২৪]

আমেরিকান সমাজের তুলনায় আমাদের সমাজের প্রবীণদের জন্য কাজের সুযোগ খুবই সীমিত। সে জন্য এখানে অবসরগ্রহণের ফলে উল্লেখযোগ্যভাবে আয় হ্রাস পায়।

তৃপ্তিসহ অবসরগ্রহণের শর্ত অথবা কি পরিস্থিতিতে একজন ব্যক্তি তৃপ্তিসহ অবসরগ্রহণ করতে পারেন এ ধরণের জিজ্ঞাসার উত্তরে আমাদের উত্তরদাতারা বিভিন্ন ধরণের মতামত দিয়েছেন। ৬৮% উত্তরদাতা অবসরগ্রহণের দুই সপ্তাহ থেকে দুইমাসের মধ্যে নিয়ম অনুযায়ী সমস্ত পেনশন ও অন্যান্য আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তৃপ্তিসহ অবসরগ্রহণ করতে পারেন বলে মতামত দিয়েছেন।

চাকরিতে থাকা অবস্থায় সন্তানাদির শিক্ষা ও বিবাহ সম্পন্ন হলে এবং একটি বাড়ি নির্মাণ করতে পারলে বা বাড়ি নির্মাণের মত অর্থ থাকলে তৃপ্তিসহ অবসরগ্রহণ করা যায় বলেও অনেকে অভিমত দিয়েছেন। ২২% উত্তর দাতা কর্মজীবনের শেষ পর্যায়ে Senior Scale প্রাপ্তি এবং ১০% উত্তরদাতা সহকর্মীদের সহানুভূতি এবং চাকরি থেকে আনুষ্ঠানিক বিদায় (Farewell) তৃপ্তি সহ অবসরগ্রহণের অন্যতম শর্ত বলে উল্লেখ করেছেন।

সামাজিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ ঃ প্রায় সমাজেই একটি জনপ্রিয় বিশ্বাস হলো অবসরগ্রহণ করলে সামাজিক সম্পর্ক, মেলামেশা তথা সামাজিক যোগাযোগে ভাঁটা পড়ে। আমেরিকান সমাজে পরিচালিত গবেষণার তথ্য উপরোক্ত বিশ্বাসকে সমর্থন করেনা। বরং অবসরপ্রাপ্তরা পরিবার সদস্য, বন্ধবান্ধব, প্রতিবেশী ইত্যাদির সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রাখেন। তদুপরি, অবসরপ্রাপ্তদের অনেকেই সমাজ কল্যাণ মূলক বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করেন। গবেষণায় এটাও দেখা গিয়েছে যে প্রাক-অবসর জীবনে যারা বেশি লোকের সঙ্গে মেলামেশা করেননি তারা অবসরগ্রহণ করলে নতুন করে মেলামেশার লোক তেমন পান না। অতএব, সামাজিক সম্পর্কের মাত্রা নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটি আগে থেকে কতটা সামাজিক বা মিশুক তার ওপর।[২৫] আমাদের পরিচালিত মতামত জরিপেও একই তথ্য এসেছে। বরং অনেকে (৫৯%) এমন মত ব্যক্ত করেছেন যে চাকরি থেকে অবসরগ্রহণের পর ব্যক্তির সামাজিক যোগাযোগ আরো বৃদ্ধি পায়। কেননা, কর্মজীবনে ব্যস্ততার জন্য হয়ত কেউ আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের খোজ খবর রাখতে পারেননি, অবসর জীবন তাঁকে সামাজিক যোগাযোগের সুযোগ এনে দেয়। তদুপরি, অনেকেই বিভিন্ন ধরণের সমাজ কর্মে অংশগ্রহণ করেন।

দাম্পত্য সম্পর্ক ঃ অবসরগ্রহণ করলে দাম্পত্য সম্পর্কের উন্নতি নাকি অবনতি ঘটে এ বিষয়ে দু'ধরণের মতই লক্ষ্য করা যায়। তবে সাধারণতঃ দেখা যায় স্বামী অবসরগ্রহণ করলে আমেরিকান সমাজে স্ত্রীরা স্বামীর পরিবর্তিত সময়সূচীর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেন।[২৬] বাংলাদেশেও এমনটিই লক্ষ্যনীয়। এ সম্পর্কে আমেরিকান সমাজে পরিচালিত গবেষণায় দেখা যায় যে পূর্ব থেকে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ভাল

থাকলে অবসরগ্রহণে সে সম্পর্ক আরও উন্নত ও গভীর হয়। পক্ষান্তরে, প্রাক-অবসর জীবনে সম্পর্ক খারাপ থাকলে সেটা ভাল হবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়-এ কথা জোর দিয়ে বলা চলেনা।[২৭] আমাদের জরিপে উত্তরদাতাদের ৮% মনে করেন অবসর জীবনে দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতি ঘটে। কেননা, স্বামীর আয় হ্রাস পাওয়া, সর্বক্ষণ বাড়িতে বেকার বসে থাকা, সংসারের সব ব্যাপারে অতিশয় কৌতুহল দেখানো (বা নাক গলানো) অনেক স্ত্রীরই পছন্দ নয়। অবসরগ্রহণকারী যদি বিধবা বা বিপত্নিক হন তবে অবসর জীবন তাঁদের কাছে একঘেয়েমিপূর্ণ এবং নিজকে অর্থহীন এবং অপ্রয়োজনীয় মনে হতে পারে। এদের অনেকেই একাকীত্ব বোধ করেন।

অবসরগ্রহণের প্রতি মনোভাবঃ

যদিও আমরা অনেককেই অবসরগ্রহণের প্রতি একটি নেতিবাচক মনোভাব পোষন করতে দেখি তথাপি আমেরিকান সমাজে পরিচালিত গবেষণায় দেখা যায় যে অধিকাংশ লোক অবসরগ্রহণকারীদের সমাজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বেশ সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে দেখেন; অবসর প্রাপ্তদের বেশ ব্যস্ত মনে হয়; তাঁদেরকে বেশ সুন্দর, আশাবাদী, স্বাস্থ্যবান, গতিশীল, সক্ষম, স্বাধীন মনে হয়; তাঁদের জীবন অর্থবহ মনে হয়।[২৮]

আমেরিকান সমাজে পরিচালিত গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে অধিকাংশ লোকেই ৬৫ বছর বয়সে Full retirement benefit সহ অবসরগ্রহণ করতে চান। অবশ্য ১৯৫০ এর দশক পর্যন্ত আমেরিকাতে অবসরগ্রহণের প্রতি প্রধানতঃ নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিই ছিল। ১৯৬০ এর দশকে আমেরিকান সমাজে Social Security Benefit দেয়া শুরু হলে অবসরগ্রহণকে অনেকেই সহজে নিতে থাকে। পরে পেনশন ও অন্যান্য বেনিফিট দেয়ার মাধ্যমে অবসরগ্রহণকে বেশ আকর্ষনীয় করে তোলা হয়েছে। ফলে ঐ সমাজে অবসরগ্রহণের প্রতি প্রতিকুল বা নেতিবাচক মনোভাবের স্থলে অনুকুল বা ইতিবাচক মনোভাব তৈরি হয়েছে।

অবসরগ্রহণের প্রতি মনোভাব নির্ভর করে সমাজে ব্যক্তির শ্রেণীগত অবস্থানের ওপর। সাধারণতঃ দেখা যায় উচ্চ আয়, উচ্চ শিক্ষা এবং উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন পেশার লোকেরা অবসরগ্রহণের প্রতি ইতিবাচক তথা অনুকুল মনোভাব পোষণ করেন। তবে কার্যতঃ তারা নিজেরা নির্দিষ্ট সময়ের আগে অবসরগ্রহণ করতে চাননা। কারণ, এ শ্রেণীর লোকেরা তাদের কাজকে বেশ চিত্তাকর্ষক, আনন্দদায়ক, উপভোগ্য এবং যথারীতি পুরস্কৃত মনে করেন।[২৯] পক্ষান্তরে অদক্ষ

এবং আধাদক্ষ শ্রমিক কর্মচারীরা অবসরগ্রহণের প্রতি প্রতিকুল বা নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন এজন্য যে তাদের বেতন একেতো কম তার উপর অবসরগ্রহণে তাদের আয় উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাবে। এঁরা অবসরগ্রহণের পর উচ্চ শিক্ষিত, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এবং দক্ষ ব্যক্তিদের মত পুনরায় কাজ পাবেন সে সম্ভাবনাও কম।

তবে এটাও লক্ষনীয় যে, যে সব কাজে স্বাধীনতা কম, বৈচিত্র কম অথচ দায়িত্ব বেশি, ঝুঁকি বেশি অথচ আয় তেমন উল্লেখ যোগ্য নয়- সে সব কাজ থেকেও অনেকেই যথা সময়ে বা নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই অবসরগ্রহণ করতে চান।[৩০]

অবসরগ্রহণের প্রতি মনোভাব নির্ভর করে অর্থের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা, সামাজিক যোগাযোগ ও কাজকর্ম, স্বাস্থ্য এবং অবসর গ্রহণের পরবর্তী সময় কিভাবে কাটবে সে সর্ম্পকে প্রাক-ধারণার ওপর।

আমাদের জরিপের উত্তরদাতাদের অনেকেই (৫২%) অবসরগ্রহণ, অবসর জীবনের সমস্যা এবং পেনশন প্রাপ্তির জটিলতা সর্ম্পকে কম বেশি সচেতন আছেন। এজন্য অবসরজীবনে যাতে আয়ের উৎস তৈরি থাকে এ ব্যাপারে তাঁরা আগে থেকেই পদক্ষেপ নিচ্ছেন। ৪৮% উত্তরদাতা অবসরগ্রহণের পর সরকারী বাসভবন ত্যাগ, পেনশনের অর্থ প্রাপ্তির জটিলতা, কর্মস্থল থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়া, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি হ্রাস, সন্তানের প্রতি দায়দায়িত্ব ইত্যাদিকে দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হবার কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। বস্তুতঃ আমেরিকান সমাজের মত আমাদের সমাজে চাকরিজীবি মানুষ অবসরগ্রহণকে সহজে মেনে নিতে পারেন না। কেননা, অবসরগ্রহণের পর আমেরিকান সমাজে অন্যত্র কাজ পেলেও আমাদের সমাজে তেমন সুযোগ খুবই বিরল।[৩১] তাছাড়া, চাকরি জীবনের সীমিত বেতন থেকে তাঁদের পক্ষে আমেরিকাবাসীদের মত সঞ্চয় করাও সম্ভব হয়ে ওঠেনা।

অবসরগ্রহণ এমন এক ঘটনা যা কর্মের ভূবন থেকে ব্যক্তিকে দুরে ঠেলে দেয়। ভূমিকা (Role and Function) পরিবর্তন হয়, দৈনন্দিন কাজের রুটীনও পরিবর্তিত হয়। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে ভূমিকা পরিবর্তনের আচার অনুষ্ঠান, যেমন-ডিগ্রী লাভ, বিবাহ ইত্যাদি কোন ব্যক্তিকে আকৃষ্ট করে; ব্যক্তি তাতে স্বপ্ন দেখে; উদ্যমী মনে এগিয়ে যায়-অবসরগ্রহণে ব্যক্তির মনে সে ধরণের উদ্যম থাকেনা। কেননা, তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারে এমন কিছু তার সামনে থাকেনা। অবসরে যে বিদায় সম্ভাষন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় তাতে

অবসরগ্রহণকারীর অতীত কীর্তির প্রশংসা করা হয় বটে-আগামীর জন্য ব্যক্তির ভূমিকা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে তেমন আকর্ষনীয় কিছু থাকেনা।

জরাবিজ্ঞানী আচলে[৯] অবসরগ্রহণ প্রক্রিয়ায় ব্যক্তির পরিবর্তনশীল মানসিকতা এবং অভিজ্ঞতার একটি চমৎকার পর্যায়ক্রমিক ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন যেটাকে একটা আদর্শ নমুনা বা ideal type হিসাবে বিবেচনা করা যায়।

১. প্রাক-অবসরগ্রহণ পর্যায় (Pre-retirement)ঃ অবসরগ্রহণের সময় ঘনিয়ে এলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অবসর জীবন সম্পর্কে একটা কাল্পনিক ধারণা পোষন করে থাকেন। অনেকে রঙিন স্বপ্ন দেখেন। যারা অবসর জীবন সম্পর্কে বাস্তব সম্মত ধারণা ও আশা পোষন করেন তারা সহজে অবসরগ্রহণের দিকে এগিয়ে যান। ভাবী অবসর জীবন সম্পর্কে যারা অবাস্তব কল্পনা রচনা করেন তারা অবসরগ্রহণে বেশ বেগ পান।

২. মধু চন্দ্রিমা পর্যায় (Honey moon)ঃ এ পর্যায়টি অবসরগ্রহণের অব্যবহৃতি পরই শুরু হয়। অবসরগ্রহণের সাথে সাথে অনেকেই মনে করেন এখন প্রচুর সময়। এতদিন যে সব কাজ সময় অভাবে করতে পারেননি এখন সে সব কাজ করবেন। ভ্রমণ, বেড়ানো, নাতি-নাতনী দেখতে যাওয়া, মাছধরা, খেলাধূলা, সবকিছু একসঙ্গে করতে মন চায়।

এ পর্যায়ে অবসর প্রাপ্ত ব্যক্তির অবস্থা ঐ শিশুর মত হয় যে নতুন খেলনায় (toys) পরিপূর্ণ একটি কক্ষে অবস্থান করে এবং সবগুলো খেলনা নিয়ে একই সময় খেলতে শুরু করে।

৩. মোহমুক্তি পর্যায় (Disenchantment) ঃ অবসরগ্রহণের পর যদি কোন ব্যক্তি সন্তোষজনক (বা তৃপ্তি দায়ক) স্থিতিশীল রুটীন তৈরি করে নিতে ব্যর্থ হন তবে হানিমুন পর্যায়ের সুখানুভূতি বা মোহ কেটে যায়। এমতাবস্থায়, তার চলাফেরা, কাজকর্ম ইত্যাদি স্বল্প আয় এবং ভগ্ন স্বাস্থ্যের কারণে সীমিত হয়ে পড়তে পারে; অথবা তিনি তার অফুরন্ত সময়কে কাজে লাগাতে বা ঐ অফুরন্ত সময়ের সঙ্গে খাপ-খাইয়ে নিতে ব্যর্থ হতে পারেন। কি করব, কিভাবে সময় কাটাব, এমন অনিশ্চয়তামূলক অনুভূতি তৈরি হতে পারে যা তার জন্য হবে অস্বস্তিকর। অনেকেই অবসরগ্রহণের বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্য মানসিকভাবে তৈরি থাকেননা। মনে রাখা দরকার অবসরগ্রহণ একটি দীর্ঘ ছুটির চেয়েও অধিকতর বেশি কিছু। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সুবাদে কোন ব্যক্তি অবসরগ্রহণের পর ২০/২৫ বছর অনায়াসে বেঁচে থাকতে পারেন। এ দীর্ঘ সময়টা অনেকের কাছে একঘেয়েমীপূর্ণ মনে হতে পারে এবং ব্যক্তির জীবনে শূন্যতা তৈরি করতে

পারে এবং নিজকে সমাজের কাছে অ-উপযোগী (useless) বা বেদরকারী মনে হতে পারে।

৪ রিওরিয়েনেটশন (Re-orientation) ঃ এ পর্যায়ে অবসর গ্রহণকারী ব্যক্তি অবসর জীবনের বাস্তবতা বুঝতে চেষ্টা করেন। তাঁর সামনে কিকি সুযোগ সুবিধে আছে সেটাও তলিয়ে দেখেন এবং যতটুকু সুযোগ সুবিধে রয়েছে তার ভিত্তিতে মোটামুটিভাবে সন্তোষজনক একটা রুটীন তৈরি করে নেন। এ কাজে তিনি হয়ত পরিবাব, বন্ধু-বান্ধব, পাড়াপ্রতিবেশী বা প্রবীণ কল্যাণ সংস্থা থেকে কখনও সাহায্য সহযোগিতা পেতে পারেন।

৫. **স্থিরতা বা স্থিতিশীলতা (Stability)ঃ** এ পর্যায়ে অবসরগ্রহণকারী ব্যক্তি অবসর জীবনের বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে থাকেন। উল্লেখ্য যে দুরদর্শি ও সচেতন ব্যক্তিদের মধ্যে যারা অবসরগ্রহণের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন তাদের কেউবা হানিমুন পর্যায় থেকে প্রত্যক্ষভাবে এ পর্যায়ে চলে আসতে পারেন। কেউবা এ পর্যায়ে পৌঁছার পূর্বেই ইহলোক ত্যাগ করেন।

৬. **সমাপন (Termination)ঃ** এ পর্যায়ে অবসর জীবন স্বাভাবিক নিত্য অভ্যাসে পরিনত হয়। "অবসরগ্রহণ করেছেন" এ ভাবনাও আর থাকেনা। কেউ নতুন কোন পার্টটাইম কাজে যোগ দেন, সমাজকর্মে বা ধর্মীয় উপাসনায় সময় কাটান এবং ধীরে ধীরে অসুস্থ্যতা বা দূর্বলতায় পেয়ে বসে- কেউবা দুর্বলতা হেতু অচল-অক্ষম হয়ে অন্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন।

দ্বিতীয় অংশ
পেনশন বা অবসর ভাতা

পেনশন

পেনশন বা অবসর ভাতা বলতে সেই অর্থকে বোঝায় যা কোন নিয়োগকর্তা তার অবসর প্রাপ্ত (বা অবসরগ্রহণকারী) কর্মচারীকে বা তাঁর মৃত্যুতে তাঁর পরিবার পরিজনকে নির্দিষ্ট হারে নিয়মিত প্রদান করেন। পেনশন বলতে এমন একটা পরিকল্পনাকে বোঝায় যাতে কোন নিয়োগকর্তা তার অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীকে নিয়মিত ভাবে (সাধারণত মাসিক কিস্তিতে) নির্দিষ্ট অর্থ প্রদান করে থাকেন।[৩৬]

একটি নির্দিষ্ট সময় সীমা পর্যন্ত সরকারী চাকরিতে অবস্থানের পর চাকরি থেকে অবসরগ্রহণ কিংবা মৃত্যুবরণ করলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর অবসর কালীন সময়ব্যাপী

অথবা তাঁর মৃত্যুতে তাঁর পরিবারের আর্থিক সংস্থানের জন্য মাসিক যে ভাতা প্রদান করা হয়-সেটাই বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পেনশন।[৩৪]

বাংলাদেশে পেনশন ও গ্রাচুইটির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

প্রাক-ব্রিটিশ আমলে এদেশে পেনশন ও গ্রাচুইটি ছিল কিনা তা জানা যায় না। বৃটিশ ভারতে তৎকালীন সরকারী কর্মচারীদের জন্য সিভিল সার্ভিস রেগুলেশনে বর্ণিত পেনশন সম্পুর্ণ ভাবে বাস্তবায়ন করা হয়নি। ব্রিটিশ আমলে কেবলমাত্র স্থায়ী সরকারী কর্মচারীদের পেনশন দেয়া হত। সে যুগে কোন গ্রাচুইটি বা আনুতোষিক প্রদান করা হত না।[৩৫]

ব্রিটিশ আমলে অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীদের বিগত ৩৬ মাসের বেতনের গড় করে যে পেনশন দেয়া হত তার পরিমাণ তথা হার আজকের তুলনায় ছিল খুবই কম। তদুপরি, বিভিন্ন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পেনশনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বৈষম্য ছিল এবং সে বৈষম্যপূর্ণ ব্যবস্থায় উচ্চ-পদস্থ কর্মকর্তারা সাধারণ পেনশন ছাড়াও অতিরিক্ত পেনশন ও সুযোগ সুবিধে পেতেন। ব্রিটিশ আমলে আজকের ন্যায় পারিবারিক পেনশন ব্যবস্থা ছিলনা।[৩৬]

১৯৪৭ সালে এদেশে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে এবং ১৯৫২ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার পেনশন রুলের সংশোধন, পরির্তন ও পরিবর্ধন করেন। ১৯৫২ সালে সর্বপ্রথম একটি সংশোধনী জারী করা হয় যার মাধ্যমে অফিসিয়েটিং এবং অস্থায়ী চাকরিকাল পেনশনের জন্য গণ্য করা হয়। ১৯৫২ সনের পে-কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার গ্রাচুইটি এবং পারিবারিক পেনশন স্কীম প্রণয়ন করেন। এই স্কীম তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকার কর্তৃক ১৯৬৬ সনের ১লা জুলাই হতে Revised Pension Rules নামে বাস্তবায়িত হয়েছিল।[৩৭]

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ১০/১২/১৯৭২ তারিখ থেকে পূর্বের ৩৬ মাসের গড় বেতনের স্থলে সর্বশেষ ১২ মাসের গড় বেতনের ভিত্তিতে পেনশন নির্ধারণ করার ব্যবস্থা নেয়া হয়।[৩৮] এর পর বাংলাদেশ পে এন্ড সার্ভিস কমিশনের সুপারিশক্রমে ২১-১-৭৪ তারিখ থেকে ১২ মাসের গড় বেতনের স্থলে চাকরি জীবনের শেষ মাসের বেতনের উপর ভিত্তি করে পেনশন নির্ধারণের ব্যবস্থা গৃহিত হয়। এই রেট চাকরির ১০ বছর হতে ২৫ বছর বা তদুর্ধ পর্যন্ত যথাক্রমে ২১% হতে সর্ব্বোচ্চ ৬০% ছিল। এর পর ১৯৭৭ সালে গ্রাচুইটি ও পেনশনের হার

সংশোধন করা হয়। যা হোক পেনশনের হার পরিবর্তনের সর্বশেষ সংশোধনীটি যা বর্তমানে কার্যকর আছে তা ৪-১১-১৯৮৯ ইংরেজী জারি করা হয়।[৩৯]

পেনশনের প্রকার ভেদ

বাংলাদেশে সরকারী চাকরির ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত প্রকারের পেনশনের ব্যবস্থা রয়েছে।

ক্ষতি পূরণ পেনশন (Compensation pension)

কোন স্থায়ী পদ বিলুপ্তির কারণে কোন কর্মচারীকে চাকরি থেকে ছাটাই করা হলে অথবা ছাটাইয়ের পর অন্য কোন সমমর্যাদা সম্পন্ন পদে বা নিম্নপদে পুনঃ নিয়োগের প্রস্তাব দেয়া সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট কর্মচারী তা গ্রহণ না করলে তিনি ক্ষতিপুরণ পেনশন পেতে পারেন। তবে চাকরির নির্ধারিত সময়ান্তে ছাটাই হলে এ পেনশন পাবেননা। ছাটাইয়ের কারণে ক্ষতিপুরণ আনুতোষিক (গ্রাচুইটি) প্রদান করা হলে এবং পরে উক্ত কর্মচারী যদি পেনশনযোগ্য চাকরিতে পুনঃ নিয়োজিত হন, তা হলে এই আনুতোষিকের সমুদয় অর্থ সরকারকে ফেরৎ না দেয়া পর্যন্ত তার পূর্বতন চাকরিকাল পেনশন যোগ্য চাকরি হিসেবে গণ্য করা হবে না। ক্ষতিপূরণ পেনশন প্রাপ্তির পর পেনশনযোগ্য চাকরিতে পুনঃ নিয়োজিত হলে, সংশ্লিষ্ট কর্মচারি তার পেনশন আংশিক বা সম্পূর্ন ভোগ করতে পারবেন। তবে যে পদে তিনি পুনঃ নিয়োগ পেয়েছেন, সে পদের বেতন এবং পেনশন মিলে পূর্ব পদে প্রাপ্ত বেতনের অধিক হবে না।[৪০]

অক্ষমতা জনিত পেনশন (Invalid Pension)

দৈহিক বা মানসিক বৈকল্যের কারণে কোন কর্মচারী সরকারী চাকরির দায়িত্ব পালনে স্থায়ীভাবে অক্ষম হবার কারণে অবসর নিলে অক্ষমতা জনিত পেনশন লাভ করবেন। তবে এ প্রকার পেনশনের জন্য মেডিকেল বোর্ডের সুপারিশসহ আবেদন করতে হবে। কোন নির্দ্দিষ্ট কাজের জন্য অক্ষম হলে যদি সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে অন্য কোন কাজে নিয়োগ করা যায় যা করতে তিনি সক্ষম তা'হলে অক্ষমতা জনিত পেনশন পাবেন না। এখানে উল্লেখ্য যে এই অক্ষমতা বিশৃঙ্খল বা অমিতাচারী বদ অভ্যাসের প্রত্যক্ষ কারণে হলে এই পেনশন পাবেন না।[৪১] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও অক্ষমতা জনিত পেনশন বিধান রয়েছে।

বয়স বা বার্ধক্যজনিত পেনশন (Superannuation)ঃ

"গণ কর্মচারী (অবসর) আইন, ১৯৭৪" এ ৪ ধারা মোতাবেক একজন গণ কর্মচারীকে ৫৭ বৎসর বয়স পূর্তিতে অবসরগ্রহণ করতে হয়। এই জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে তার ৫৭ বৎসর বয়স পূর্তির পূবেই ছুটি পাওনা সাপেক্ষে অবসরগ্রহণ প্রস্তুতিমূলক ছুটিতে (Leave Preparatory Retirement, L.P.R) যেতে হয় এবং ৫৭ বছর বয়স পূর্তির পর পরই স্বাভাবিক নিয়মে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী পেনশন লাভ করবেন যাকে বয়স বা বাধ্যক্য জনিত পেনশন নামে আখ্যা দেয়া হয়।[৪২]

অবসর জনিত পেনশন (Retiring Pension)

একজন কর্মচারীর বয়স ৫৭ বৎসর পূর্ণ না হওয়া সত্ত্বেও চাকরির ২৫ বৎসর পূর্ণ হলে সরকার যে কোন কর্মচারীকে কোন প্রকার কারণ না দেখিয়ে জনস্বার্থে চাকরি হতে অবসর দিতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে বিধি মোতাবেক সংশ্লিষ্ট কর্মচারী পেনশন প্রাপ্ত হবেন [৪৩]

ঐচ্ছিক পেনশন (Optional Pension)

২৫ বছর চাকরি করার পর ৫৭ বছর বয়স পূর্ণ না হলেও একজন ব্যক্তি চাকরি থেকে যথারিতি অবসরগ্রহণের মাধ্যমে পেনশন লাভ করতে পারবেন।[৪৪] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও এ ধরণের পেনশন ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

পারিবারিক পেনশন (Family Pension)

একজন সরকারী কর্মচারী পেনশন প্রাপ্তির যোগ্যতা অর্জন করে চাকরিরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে অথবা অবসরগ্রহণের পর মৃত্যুবরণ করলে উক্ত কর্মচারীর পরিবারকে যে পেনশন দেয়া হয় তাই পারিবারিক পেনশন। পারিবারিক পেনশন সংক্রান্ত কতগুলো নিয়মাবলী রয়েছে। এর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নিয়ম নিম্নে উল্লেখ করা হল।[৪৫]

১. একজন চাকরিজীবি অবসরগ্রহণের পূর্বে মৃত্যুবরণ করলে তার পরিবার যে হারে পারিবারিক পেনশন পেতেন অবসর গ্রহনের পর মৃত্যুবরণ করলেও একই হারে তার পরিবার পেনশন পাবেন (১/৬/১৯৯৪ তারিখ থেকে)।

২. বিধবা স্ত্রীরা পুনবির্বাহ না করলে আজীবন পারিবারিক পেনশন পাবেন (১/৬/১৯৯৪ তারিখ থেকে)।

৩. উপার্জনে অক্ষম প্রতিবন্ধী সন্তানরা আজীবন পেনশন পাবেন (১/৬/১৯৯৪ তারিখ থেকে)।

৪. ২৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত পুত্র সন্তানগণ পেনশন পাবেন।

৫. অবিবাহিত, বিধবা অথবা তালাক প্রাপ্ত মেয়েরা পেনশনারের অবসরগ্রহণের তারিখ হতে ১৫ বৎসর মেয়াদকাল পূর্তির কোন সময়কাল অবশিষ্ট থাকলে অবশিষ্ট সময়ের জন্য পেনশন পাবেন (১/৬/১৯৯৪ তারিখ থেকে)।

৬. আত্ম-হত্যার কারণে মৃত চাকরিজীবির পরিবার অথবা তার মনোনীত ব্যক্তি (যদি থাকে) স্বাভাবিক মৃত্যুর ন্যায় পারিবারিক পেনশন ও আনুতোষিক পাবেন।

৭. মৃত পেনশনারের স্ত্রী অথবা পরিবারের কোন সদস্য না থাকলে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ উত্তরাধিকার নির্ণয় করবেন। এ ক্ষেত্রে আর কোর্ট থেকে "সাকসেশন সার্টিফিকেট" গ্রহণের প্রয়োজন হবে না।

৮. মৃত পেনশনারের স্ত্রী পুনর্বিবাহ করেন নাই এই মর্মে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/পৌরসভা চেয়ারম্যান/মেট্রোপলিটন এলাকার ক্ষেত্রে ওয়ার্ড কমিশনারের সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে সর্বশেষ নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার প্রদত্ত সার্টিফিকেট গ্রহণ যোগ্য হবে।

৯. মৃত কর্মচারী মহিলা হলে তার স্বামী বা পরিবার ১৫ বৎসর পর্যন্ত পারিবারিক পেনশন পাবেন।

পেনশন প্রাপ্তির যোগ্যতা, শর্ত ও নিয়মাবলী

কর্মচারীর আচরণগত যোগ্যতা

১. ভাল আচরণ সরকারী পেনশন প্রাপ্তির একটি শর্ত। কোন সরকারী পেনশনার গুরুতর কোন অপরাধের জন্য শাস্তিপ্রাপ্ত হলে বা কোন মারাত্মক ধরণের অসদাচরণের দোষে দোষী হলে তার পেনশন সম্পুর্ণ বা আংশিক ভাবে স্থগিত করণের বা প্রত্যাহারের ক্ষমতা সরকার সংরক্ষণ করেন। তবে মারাত্মক অসদাচরনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে তার আচরণ সর্ম্পকে লিখিত বা মৌখিক ভাবে ব্যাখ্যা প্রদানের সুযোগ না দিয়ে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করা যাবেনা ।[৬৬]

২. বিভাগীয় বা বিচার বিভাগীয় মামলায় যদি প্রমানিত হয় যে, সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মচারীর কর্মরত থাকাকালীন সময়ে কোন অসতর্কতা বা অবহেলার কারণে সরকারের কোন আর্থিক ক্ষতি হয়েছে তা হলে এই ক্ষতির জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পেনশন হতে আদায়ের আদেশ দানের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতি সংরক্ষণ করেন। তবে উক্ত বিভাগীয় মামলা সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর চাকরিরত অবস্থায় আরম্ভ না হলে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ছাড়া বিভাগীয় মামলা আরম্ভ করা যাবেনা এবং যে ঘটনার প্রেক্ষিতে বিভাগীয় মামলা আরম্ভ হবে উক্ত ঘটনা সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর সর্বশেষ কর্মরত থাকার অনধিক এক বছরের মধ্যে সংঘটিত হতে হবে ও এই বিভাগীয় মামলা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে নির্ধারিত ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত হবে।

৩. অসদাচরণ, অদক্ষতা বা দেউলিয়া হবার কারণে চাকরি হতে অপসারিত বা বরখাস্ত হলে সরকারী পেনশন মঞ্জুর করা যাবেনা। তবে চরম আর্থিক সংকটে বিশেষ বিবেচনায় অনুকম্পা ভাতা মঞ্জুর করা যেতে পারে

যে যে ক্ষেত্রে পেনশনের দাবী গ্রহণযোগ্য নয়

যখন কোন কর্মচারীকে একটি নির্দিষ্ট কর্মের জন্য নিয়োগ করা হয়। অথবা যখন কোন কর্মচারী অনিয়মিত সময়ের জন্য বা অনির্ধারিত কর্মে মাসিক মজুরীর ভিত্তিতে অস্থায়ী ভাবে নিয়োজিত হন তখন সে কাজ শেষে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী কোন পেনশন দাবী করতে পারবেন না। একইভাবে যখন কোন কর্মচারী সার্বক্ষনিক সময়ের জন্য নিয়োগ প্রাপ্ত না হয়ে শুধুমাত্র রাষ্ট্রের পক্ষেকোন কাজের জন্য পারিশ্রমিক প্রাপ্ত হন, যেমন সরকারী উকিল বা 'ল' অফিসার তারাও কোন পেনশন পাবেন না। অন্য কোন পেনশন যোগ্য পদে অধিষ্ঠিত থাকলে এবং পেনশন সংক্রান্ত শর্ত নাই এমন কোন চুক্তির অধীনে চাকরি করলেও পেনশন দাবী করতে পারবেন না।

পেনশন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা

কোন কর্মচারী একই সময়ে কোন অবস্থায় দুইটি পেনশন অর্জন করতে পারবেন না; আবার দুইজন কর্মচারী একই পদে পেনশন পাবেন না।

পেনশন প্রাপ্তির শর্ত ও নিয়মাবলী

আঠার বৎসর পূর্তির পরের চাকরি পেনশন যোগ্য চাকরি হিসাবে গণ্য হবে। সরকারী পর্যায়ে পেনশন যোগ্য চাকরির শর্ত হলো-চাকুরিটি সরকারী এবং স্থায়ী

হতে হবে। তাছাড়া সরকার থেকে বেতন ভাতাদি প্রদত্ত হতে হবে।[৪৭] ছয় মাস অথবা এর কম সময় পেনশন যোগ্য চাকরিতে ঘাটতি থাকলে তা অবশ্যই মওকুফ করতে হবে। আর যদি ঘাটতি কাল ছয় মাসের বেশী কিন্তু এক বছরের কম হয় তা হলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর চাকরি সন্তোষজনক হলে এবং এই অবসরগ্রহণ মৃত্যু জনিত বা তার নিয়ন্ত্রন বর্হিভূত কোন পরিস্থিতির কারণে হলে যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষ তা মওকুফ করতে পারবেন ।[৪৮]

অসাধারণ ছুটি কালীন সময় ব্যতীত অন্যান্য ছুটি কালীন সময় পেনশন যোগ্য চাকরী হিসাবে গণ্য হবে। তবে অসাধারণ ছুটিকালীন সময় মোট চাকরি কাল গণনায় ধরা হলেও পেনশনের হার নির্ধারনের সময় মোট চাকরির কাল হতে অসাধারন ছুটি কালীন সময় বাদ দিয়ে বাকী সময়ের ভিত্তিতে পেনশনের হার নির্ধারিত হবে।

যে চাকরির জন্য স্থানীয়, স্বায়ত্ব শাসিত সংস্থা, ট্রাষ্ট, ফান্ড এবং জাতীয়করণকৃত সংস্থা হতে বেতন দেয়া হয় অথবা যে চাকুরির বেতন কমিশন বা ফি হতে প্রদান করা হয় সে সব চাকুরি পেনশন যোগ্য চাকুরি হিসাবে গণ্য হবে না।[৪৯] অক্ষমতাজনিত মেডিকেল সার্টিফিকেট দাখিল করার পরবর্তী সময়ের চাকরি যথাযথ কর্তৃপক্ষের বিশেষ আদেশ ব্যতিরেকে পেনশন যোগ্য চাকরি হিসাবে গণ্য হবে না। শিক্ষানবিশীন কাল শেষে চাকরিতে স্থায়ী হলে এই শিক্ষানবিশীন কালের চাকরি পেনশন যোগ্য চাকরি হিসাবে গন্য হবে।[৫০]

পেনশনার মারা গেলে মৃত্যুর এক বৎসরের মধ্যে আবেদন করা হলে বকেয়া পেনশনের অর্থ তাঁর আইনসংগত উত্তরাধিকারীগনকে প্রদান করা যাবে। আর এক বৎসরের মধ্যে আবেদন না করলে পেনশন মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষের মঞ্জুরী ব্যতীরেকে তা আর প্রদান করা যাবেনা।[৫১] স্থায়ী পদে স্থায়ী হিসাবে নিয়োজিত না হলে অবসর ভাতা প্রাপ্য হবে না। তবে অস্থায়ী পদে পাঁচ বৎসরের অধিক এক নাগাড়ে চাকরি করেছেন এমন কর্মচারী তাঁর এই চাকরিকাল পেনশন ও গ্রাচুইটি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে গণনা করতে পারবেন।

পেনশন এবং গ্রাচুইটির হার নির্ধারণ

অবসরগ্রহণকারী ব্যক্তি বা তাঁর মৃত্যুতে তার পরিবার প্রতিমাসে নিয়মিত যে অর্থ পান সেটাই হলো পেনশন বা অবসর ভাতা। পক্ষান্তরে অবসরগ্রহণকারী ব্যক্তি অবসরগ্রহণের সাথে সাথে অথবা তাঁর মৃত্যুতে তার পরিবার মোট পেনশনের অর্ধেক বা সম্পুর্ন সারেন্ডার করে এককালীন যে অর্থ লাভ করেন তাকে বলা হয় গ্রাচুইটি (gratuity) বা আনুতোষিক।

বাংলাদেশে বর্তমান নিয়মানুযায়ী দশ বছর চাকরি না করলে কাউকে পেনশন দেয়া হয় না।[৫২] অর্থাৎ পেনশন লাভ করতে হলে পেনশন যোগ্য চাকরিতে নিম্নতম দশ বছর চাকরি করতে হবে। পেনশন বা গ্রাচুইটি হিসেবের ক্ষেত্রে চাকরি জীবনের প্রাপ্ত শেষ মাসের বেতন এবং চাকরি কাল খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোন ব্যক্তি যদি দশ বছর চাকরি করে অবসরগ্রহণ করেন তবে তিনি তার চাকরি জীবনের সর্ব শেষ মাসে প্রাপ্ত বেতনের ৩২% পেনশন পাবেন। চাকরি কাল যত বেশি হবে পেনশনের হারও নির্দিষ্ট নিয়মে বৃদ্ধি পাবে এবং এভাবে ২৫ বা তদুর্ধ বছর চাকরি করে অবসরগ্রহণ করলে সর্ব্বোচ্চ ৮০% হাবে পেনশন লাভ করবেন।[৫৩] তবে শর্ত হলো গ্রস পেনশনের পরিমান সর্ব্বোচ্চ ৮,২০০ টাকার অধিক হবে না এবং সর্বনিম্ন পেনশনের পরিমান ১০০ টাকার কম হবে না। এই হারে প্রাপ্ত মোট পেনশনের ওপর ভিত্তি করেই গ্রাচুইটি নির্ধারিত হবে।

একজন সরকারী কর্মচারী অবসরগ্রহণের সময় তার গ্রস বা মোট পেনশনের অর্ধেক বাধ্যতামূলক ভাবে সমর্পণ (surrender) করবেন এবং সমর্পণকৃত প্রতি এক টাকার জন্য নিম্নোক্ত হারে তিনি বা তাঁর মৃত্যুতে তার পরিবার এককালিন গ্রাচুইটি বা আনুতোষিক পাবেন।

পেনশন যোগ্য চাকরিকাল ১০ থেকে ১৪ বছর হলে সমর্পণকৃত প্রতি এক টাকার জন্য ২৩০ টাকা; চাকরিকাল ১৫ থেকে ১৯ বছর হলে সমর্পণকৃত প্রতি এক টাকার জন্য ২১৫ টাকা এবং চাকরিকাল ২০ বা এর অধিক হলে সমর্পণকৃত প্রতি এক টাকার জন্য ২০০ টাকা গ্রাচুইটি বা আনুতোষিক লাভ করবেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পেনশন ও গ্রাচুইটির পরিমাণ নির্ধারণে সরকারী নিয়ম অনুসরন করা হয়। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পেনশন সমর্পনের বিনিময়ে এককালীন প্রদেয় অর্থকে গ্রাচুইটি বলা হয় না বরং এখানে কমুটেশন (commutation) শব্দটি ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে নিয়ম হলো ১০ বছর বা তার উর্ধ্বে (যত বছরই হউক) চাকরি কাল হতে বেতনের যে অংশ গ্রস পেনশন হবে তার ৫০% সমর্পণ করে যে অর্থ হবে তাই কমুটেশান।

কোন সরকারী কর্মচারী ইচ্ছা করলে অবশিষ্ট ৫০% পেনশনও সমর্পণ করতে পারেন। এই সমর্পণকৃত ৫০ ভাগের জন্য নির্ধারিত বিনিময় হারের অর্ধহারে আনুতোষিক প্রাপ্ত হবেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও এই সরকারী নিয়মটি অনুসরণ করা হয়।[৫৪]

বর্তমান পেনশন এবং গ্রাচুইটির প্রতি অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীদের মনোভাব

১৯৫৫ সালে স্থাপিত বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি হলো বাংলাদেশের অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীদের মুখপাত্র যা তাঁদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে সরকারের সঙ্গে দেন-দরবার করে থাকে। রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট সর্ম্পকে বাংলাদেশের অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীদের মতামত ও ঐ সব প্রচলিত সুযোগ-সুবিধার প্রতি তাদের প্রতিক্রিয়াগুলো উক্ত সমিতির মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। তাই বর্তমান পেনশন ও গ্রাচুইটির প্রতি তাদের মনোভাব জানার জন্য আমরা উক্ত সমিতির স্মরনাপন্ন হয়েছিলাম।

উক্ত সমিতি অতি সম্প্রতি (২৮-১-৯৭ইং) ২৫ ও তদূর্ধ বৎসর চাকরিকাল হলে বর্তমানের ৮০% থেকে ১০০% হারে পেনশন নির্ধারণের জন্য বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় বেতন কমিশন (১৯৯৬) এর কাছে আবেদন করেছেন।[৫৫] অন্যদিকে আমাদের জরিপের ৯৭% উত্তরদাতাই এটি ৮০% থেকে ১০০% করার পক্ষে মতামত দিয়েছেন। তবে ৩% উত্তরদাতা মনে করেন এটি বৃদ্ধি করা উচিৎ নয়। বৃদ্ধি করা হলে অধিকাংশ মানুষই ২৫ বছর কাজ করার পর চাকরি ছেড়ে দিবেন বলে তাঁরা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

বর্তমানে ১০ বৎসর চাকরি না হলে পেনশন দেয়া হয়না। উক্ত সমিতি পেনশনের জন্য চাকরির সর্বনিম্ন দৈর্ঘ দশ বৎসরের স্থলে পাঁচ বৎসরের জন্য বেতন কমিশনের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। এই সমিতি বর্তমানের সর্বনিম্ন ১০০ টাকা পেনশনের স্থলে ২০০০ টাকা এবং গ্রাচুইটির হার বৃদ্ধির জন্যও আবেদন জানিয়েছেন।

প্রতিবার নতুন বেতন স্কেল ও পেনশনের নতুন হার নির্ধারণের সময় মাত্র ১ (এক) দিনের ব্যবধানে সমশ্রেণীর পেনশনারগণের পেনশন ও গ্রাচুইটির পরিমাণে ভীষণ বৈষ্যমের সৃষ্টি হয়। অথচ উভয় ধরণের পেনশনার (নতুন ও পুরাতন) একই আর্থ-সামাজিক পরিবেশে দিন যাপন করেন। এ কারণে একই পদমর্যাদার পদ থেকে অবসরপ্রাপ্ত নতুন ও পুরাতনদের পেনশনে যে বিরাট বৈষম্য বা ব্যবধান তৈরি হয় তা দুর করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে ঐ সমিতির আবেদন হলো সমগোত্রীয় ও সমমর্যাদার পেনশনারগনের পেনশন নতুন পেনশনারগনের সমান করে দিতে হবে। এ জন্য বার বার সরকারী আদেশ জারী না করে স্বয়ংক্রীয় ভাবে পেনশন বাড়ানোর একটি ষ্টানডিং আদেশ জারী করা যেতে পারে।

বর্তমানে সরকারী কর্মচারীদেরকে পেনশনে যাবার পূর্বে এক বৎসরের জন্য এল.পি.আর প্রদান করা হয়। এ ছুটিতে প্রথম ৬ মাসের পূর্ণ বেতন এবং পরবর্তী ছয় মাসের অর্ধেক বেতন দেয়া হয়। যেহেতু এই ছুটি মূলতঃ পেনশনারের অর্জিত

ছুটি তাই পুরো বার মাসের পূর্ণ বেতন প্রদান করা প্রয়োজন বলে বাংলাদেশ অবসর প্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি মনে করে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে সরকারী কর্মচারীদের এল,পি, আর সময়সীমা এক বছর অথচ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এই ছুটি সীমা মাত্র ছয় মাস।

আমাদের পরিচালিত গবেষণায়ও দেখা গেছে অধিকাংশ উত্তরদাতাই (৯৮%) সরকারী এবং বেসরকারী সর্বক্ষেত্রে পূর্ণ বেতনে ১২ মাসের এল.পি. আর এর পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেছেন।

সাধারনতঃ মানুষ বার্ধক্যে অবসরগ্রহণ করেন এবং বার্ধক্যেই নানাবিধ রোগ শোকে পেয়ে বসে। কর্মজীবনের তুলনায় বার্ধক্যে চিকিৎসা খরচ বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। তাই, উক্ত সমিতির আবেদন এই যে একজন চাকরিরত কর্মচারী যে পরিমাণ চিকিৎসা ভাতা পান একজন পেনশনারকে যেন অন্ততঃ তার দ্বিগুন চিকিৎসা ভাতা প্রদান করা হয়- অথবা কমপক্ষে মাসিক ৫০০/-টাকা চিকিৎসা ভাতা হিসেবে বরাদ্ধ করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে আমাদের গবেষণায়ও সমস্ত উত্তরদাতাই চিকিৎসাভাতা বৃদ্ধির পক্ষে মতামত দিয়েছেন। অনেকে স্বাস্থ্য বীমার প্রস্তাবও দিয়েছেন।

বর্তমানে বেনেভোলেন্ট ফান্ড বা কল্যাণ তহবিলের কোন অর্থই সরকারী পেনশনারগণকে দেয়া হয়না-অথচ এই তহবিলেই তারা তাদের নিজস্ব কষ্টার্জিত অর্থ প্রদান করে এসেছেন। এই অর্থ যদি তারা জীবন বীমা বা অন্য কোনভাবে বিনিয়োগ করতেন তবে তা থেকে আয় বা রিটার্ণ নিশ্চয়ই পেতেন। তাই বাংলাদেশ অবসর প্রাপ্ত সরকারী কল্যাণ সমিতির আবেদন কল্যাণ তহবিলে প্রদত্ত টাকা যেন পেনশনারদের ফেরৎ দেয়া হয়। গোষ্ঠী বীমার টাকা ফেরৎ প্রদানের জন্যও উক্ত সমিতি আবেদন জানিয়েছেন। কেননা জীবিত কি মৃত কোন অবস্থায়ই সরকারী কর্মচারী গোষ্ঠী বীমার কোন সুযোগ সুবিধে পান না। অথচ তাদের কষ্টার্জিত বেতন থেকেই গোষ্ঠী বীমা কেটে নেয়া হয়। সমিতির বিবেচনায় এটা মোটেই ন্যায় সঙ্গত নয় এবং সে কারণে সমিতির প্রস্তাব হল গোষ্ঠী বীমা কে Endowment Policy তে রুপান্তরিত করা হোক যাতে অবসরগ্রহণের সাথে সাথে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী তার দেয় চাঁদানুযায়ী বীমাকৃত পলিসির টাকা সাকুল্যে এক সঙ্গে পেতে পারেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক এবং কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন থেকে কর্তিত টাকা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুদান দ্বারা বেনেভোলেন্ট ফান্ড গঠন করা হয়। এ ফান্ড থেকে শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের একটি বেনিফিট দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। এই প্রসঙ্গে Provident fund এর কথা উল্লেখ করা যায় যা শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের Contribution এ গঠিত। এই তহবিলের টাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রতিরক্ষা সঞ্চয় পত্রে বা Fixed deposit হিসেবে ব্যাংকে বিনিয়োগ করেন। যখন ব্যক্তি অবসরগ্রহণ করেন বা মারা যান তখন তিনি বা তাঁর পরিবার প্রদেয় অর্থ সুদ সহ ফেরৎ পান। প্রয়োজনে এই তহবিল থেকে আগাম ঋনও নেওয়া যায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ও অফিসারদের জন্য ৩ লক্ষ টাকা এবং ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য যথাক্রমে এক লক্ষ বিশ হাজার ও ৬০ হাজার টাকার গোষ্ঠী বীমা করা হয়। সংশ্লিষ্ট সবাইকে নির্দিষ্ট হারে প্রিমিয়াম দিতে হয়। চাকরি অবস্থায় স্বাভাবিক মৃত্যু হলে সবাই স্ব স্ব বীমাকৃত টাকা ফেরৎ পান তবে দূর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করলে বীমাকৃত টাকার দ্বিগুন ফেরৎ পাওয়া যায়।

সরকারী বা স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সব কর্মচারী বা চাকুরে বৎসরে দুবার উৎসব ভাতা পান। অবসরগ্রহণকারী ব্যক্তিকেও সামাজিক জীবনে বিভিন্ন উৎসবে অংশগ্রহণ করতে হয়। অথচ তাদের কে কোন উৎসব ভাতা প্রদান করা হয় না। সমিতি পেনশনারদের উৎসব ভাতা প্রদানের জন্যও আবেদন জানিয়েছে। আমাদের পরিচালিত গবেষনার ৯৮% উত্তরদাতাও পেনশনারদের উৎসব ভাতা প্রদান করার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেছেন।

সরকারী চাকরি থেকে যে আয় হয়, তা দিয়ে সংসার চালিয়ে অনেকের পক্ষেই বাড়ী নির্মাণ করা সম্ভব হয় না। তাই, উক্ত সমিতি পেনশনারগণকে বাড়ী ভাড়া প্রদানের জন্য বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় বেতন কমিশন-১৯৯৬ এর কাছে আবেদন জানিয়েছে। তদুপরি, উক্ত সমিতি প্রতি বছর দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির হার অনুযায়ী বেতন ও পেনশন স্বয়ংক্রিয়ভাবে বৃদ্ধি করারও প্রস্তাব করেছেন।

আমাদের পরিচালিত মতামত জরিপের ৭৪% উত্তরদাতা আমাদের সমাজের স্বনিয়োজিত পেশায় (যেমন-কৃষি কাজ) নিয়োজিত প্রবীণ ব্যক্তিদের জন্য বার্ধক্য ভাতা প্রদানের লক্ষ্যে মতামত দিয়েছেন। উল্লেখ্য যে বর্তমান সরকার তার প্রথম বাজেটে (জুন, ১৯৯৭) প্রতি ওয়ার্ডে দশ জন ব্যক্তিকে বয়স্ক ভাতা (মাসে ১০০ টাকা) প্রদানের কথা সুপারিশ করেছে যার কমপক্ষে ৫০% হবেন মহিলা প্রবীণ। দেশের প্রয়োজনের তুলনায় এটা কম হলেও এটাকে শুভ সূচনা বলা যেতে পারে।

দীর্ঘদিন ধরেই একটি সাধারণ অভিযোগ হলো পেনশন প্রাপ্তিতে জটিলতা। সরকার এ বিষয়ে অবহিত। এ কারণেই ১৯৯৪ সালে সরকার পেনশন সহজীকরণের লক্ষে একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। আমাদের জরিপের ৬৭% উত্তর দাতা এ বিষয়ে অবহিত নন। বাকি ৩৩% উত্তর দাতার মত হলঃ উক্ত সহজীকরণ আইন খুব একটা বাস্তবায়িত হয়নি। কারণ হিসেবে তারা প্রশাসনিক জটিলতা, সংশ্লিষ্টদের গড়িমসি, হয়রানি ও লাল ফিতার দৌরাত্নের কথা উল্লেখ

করেছেন।[৫৬] ১৯৯৪ সালের পেনশন প্রাপ্তি সহজীকরণ ব্যবস্থার আইনের কিছু সুফল পাওয়া গেলেও নানা কারণে পেনশন প্রাপ্তিতে বেশ কিছু সমস্যা রয়েই গিয়েছে।[৫৭]

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, আগামীতে অবসরগ্রহণ করতে যাচ্ছেন এমন ব্যক্তিদের জন্য আমেরিকান সমাজে Pre-retirement counselling ব্যবস্থা রয়েছে যা অবসর জীবনকে সহজে গ্রহণ করতে, রিটায়ারমেন্ট বেনিফিটের সর্বোচ্চ লাভজনক ব্যবহার নিশ্চিত করতে এবং অবসর জীবনের সময়কে অধিকতর যুক্তিসঙ্গতভাবে কাজে লাগিয়ে বার্ধক্যের জীবনকে আরও অর্থবহ ও উপভোগ্য করে তুলতে সাহায্যে করে।[৫৮] আমাদের সমাজেও এ ধরণের উদ্যেগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

উপসংহার

আমাদের সমাজে বেকারত্বের কথা চিন্তা করলে বয়সভিত্তিক বাধ্যতামূলক অবসরগ্রহণ ব্যবস্থা অনস্বীকার্য এবং অবসরগ্রহণের বয়সসীমা অতিরিক্ত বৃদ্ধি করার সুযোগ খুবই সীমিত। পক্ষান্তরে, আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সুবাদে মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অনেকে বার্ধক্যে পৌঁছার পরও তথা ৬০ বছর বয়সের পরও সুস্থ-সবল ও কর্মঠ থাকছেন। এসব ষাটোর্ধ বয়সীদের একটি অংশ যুব বয়সীদের একটি অংশের মতই বা তাদের চেয়ে অধিক কর্মঠ ও পারদর্শী (অভিজ্ঞতো বটেই)। বাধ্যতামূলক অবসরগ্রহণের ফলে প্রবীণের এ অংশটিও অবসরগ্রহণে বাধ্য হন। এটা কতটুকু ন্যায় সঙ্গত বা যৌক্তিক তা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে। যা হোক আমাদের সমাজে চরম বেকারত্ব না থাকলে বয়স নয় বরং দক্ষতা ও কর্মক্ষমতাই হতে পারত অবসরগ্রহণ বা অবসর প্রাপ্তির একমাত্র ভিত্তি। তাই, বর্তমান অবস্থায় অবসরগ্রহণের পর প্রবীণের জন্য তাঁদের কর্মক্ষমতানুযায়ী বিকল্প কাজের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এতে প্রবীণের জীবন আরও অর্থবহ, তাৎপর্যপূর্ণ এবং উপভোগ্য হবে। সেই সঙ্গে তাঁরা নিজেদেরকে সমাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং সমাজে নিজদেরকে useful মনে করবেন। এ ব্যাপারে সরকার এবং বিশেষ করে এনজিও গুলো বিশেষ অবদান রাখতে পারে।

অবসরগ্রহণের ফলাফল বা প্রভাব নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আয়, স্বাস্থ্য, পরিবার, সমাজ এবং তাঁর সামাজিক যোগাযোগের বলয় ও প্রকৃতির ওপর। সাধারণভাবে বলা যায় যে, যে সমাজে বেতন, আয় তথা সঞ্চয় যত বেশী এবং যে সমাজ টেকনোলজীতে যত বেশী অগ্রসর সে সমাজে অবসরগ্রহণকারী ব্যক্তির ওপর অবসরগ্রহণের প্রতিকূল প্রভাব ততই কম। আসলে যে সব সমাজ অবসরগ্রহণকে সহজে মেনে নেয়ার জন্য আকর্ষনীয় পেনশন, গ্রাচুইটি ইত্যাদি

(Pull factor) প্রদানে সক্ষম সে সমাজে অবসরগ্রহণের ফলাফল বা প্রভাব ততই কম নেতিবাচক। বস্তুতঃ এ সব সমাজে অবসরগ্রহণের প্রতি অনেকেরই অনুকূল মনোভাব ব্যক্ত হয়। এ আলোকেই আমাদের প্রবীণ সমাজের অবস্থা বিচার্য।

অবসরগ্রহণ একটি প্রক্রিয়াও বটে। একটি নতুন জীবনে অর্থাৎ অবসর জীবনে অভ্যস্ত হবার প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় সফলভাবে খাপ-খাইয়ে নিতে হলে অবসর জীবনের বাস্তবতাকে সহজে মেনে নিতে হবে। আগে থেকেই যার যার সামর্থ অনুযায়ী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে যাতে জীবন সায়াহ্নের দিনগুলি অধিকতর অর্থবহ ও উপভোগ্য হয়। এ লক্ষ্যে অবসরগ্রহণের পূর্বেই Counselling and guidance এর জন্য স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে যেখানে অভিজ্ঞ সমাজবিজ্ঞানী, জরাবিজ্ঞানী (gerontologist), সমাজকর্মী, মনোবিজ্ঞানী এবং বার্ধক্য বিষয়ক রোগের চিকিৎসকগণ (geriatrician) বিশেষ অবদান রাখতে পারেন।

রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট তথা পেনশন ও গ্রাচুইটির প্রতি মনোভাব সমীক্ষান্তে যে সব সুপারিশ পেশ করা যায় তার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দিক হলোঃ পেনশন, গ্রাচুইটি তথা কমুটেশনের হার বৃদ্ধি , পেনশন প্রদানে চাকরির দৈর্ঘ হ্রাস, সর্বনিম্ন পেনশনের পরিমান বৃদ্ধি, নতুন ও পুরাতন পেনশনারদের মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণ (সরকারী চাকরির ক্ষেত্রে এল,পি,আর সময়ের পূর্ণ বেতন প্রদান, পেনশনারগণ কর্তৃক বেনেভোলেন্ট ফান্ড বা কল্যাণ তহবিলে প্রদত্ত টাকা এবং গোষ্ঠির বীমার টাকা ফেরৎ প্রদান), চাকরিজীবিদের মতই পেনশনারদের উৎসব ভাতা ও বাড়ীভাড়া প্রদান, দ্রব্যমূল্য তথা জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বেতন ও পেনশন স্বয়ংক্রিয়ভাবে বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা গ্রহণ।

কালবিলম্ব না করে পেনশন প্রাপ্তির সবধরনের জটিলতা দূর করা এবং অবসরগ্রহণের সাথে সাথে যাতে গ্রাচুইটি ও পেনশন লাভ করা যায় সে জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ জন্য প্রয়োজন বোধে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পেনশন মঞ্জুর ও পেনশন প্রাপ্তির নিয়ম সম্পর্কে প্রশিক্ষণদান এবং পেনশন মঞ্জুরীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করাও প্রয়োজন।

তথ্যনির্দেশ

১. চাকরির জন্য প্রার্থী বাছাই, নির্বাচন, প্রশিক্ষণ, কর্মে নিয়োগ বা কর্মে স্থাপন (Placement) সংক্রান্ত নীতিমালা বা তত্ত্বগত আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের পরিধির বাইরে রাখা হয়েছে।

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস ব্যবস্থাপনা, সংস্থাপন বিভাগ এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশনের কাঠামো ও ভূমিকা সম্পর্কে জানতে হলে দেখুন, Syed Giasuddin Ahmed, *Public Personnel Administration in Bangladesh*, Dhaka: University of Dhaka (1986) এবং *Bangladesh Public Service Commission*, Dhaka: University of Dhaka (1990).

২. ঢাকা নগরে বসবাসরত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি ক্ষুদ্রাংশের মধ্যে পরিচালিত আমাদের জরিপের উত্তরদাতাদের বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশা সম্পর্কে তথ্যাবলী

বয়স	সংখ্যা	%
৩০-৩৯	১০	১৯%
৪০-৪৯	২৫	২৫%
৫০-৫৯	৩০	৩০%
৬০-ঊর্ধে	৩৫	৩৫%
মোট		১০০

শিক্ষাগত যোগ্যতা	সংখ্যা	%
এস.এস.সি	৫	৫%
এইচ.এস.সি	৩	৩%
স্নাতক	২৮	২৮%
মাস্টার্স	৫২	৫২%
পি.এইচ.ডি	১২	১২%
		১০০

পেশা	সংখ্যা	%
শিক্ষক	২৩	২৩%
চিকিৎসক	৩৭	৩৭%
প্রকৌশলী	১২	১২%
ব্যাংক কর্মকর্তা	২০	২০%
অন্যান্য	৮	৮%
		১০০

৩. দেখুন Diana K Harris, *Dictionary of Gerontology*. New York: Green Wood Press. (1988) P.152.

৪. এ সম্পর্কে অধিক জানার জন্য দেখুন, M.Biesele, and N. Howell, "The old People give you life: Aging among Kung hunter gatherers". In P. Amos & S. Harrell (eds), *Other ways of growing old*. Standford, Stanford Univ. Press (1981) এবং Diana K.Harris, *Sociology of Aging* NewYork: Harper and Row (1990).

৫. বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন, Russell A Ward, *The Ageing Experience: An Introduction to Social Gerontology*. New York: Harper and Row(1984) এবং প্রাগুক্ত Harris, (1990).

৬. দেখুন, David L.Decker, *Social Gerontology: An Introduction to the Dynamics of Aging*. Boston: Little, Brown & Co. (1980) এবং প্রাগুক্ত Ward (1984).

৭. দেখুন প্রাগুক্ত Ward (1984) এবং Harris (1990).

৮. দেখুন প্রাগুক্ত Harris (1988) P. 113 Ott Johnson, (ed.) *Almanac: Atlas & Year Book*. N.Y.: Houghton Mifflin Co (1997). বর্তমানে আমেরিকান সমাজে ৬২ বছর বয়সে অবসরগ্রহণ করলে ৮০% এবং ৬৫ বছর বয়সে অবসরগ্রহণ করলে full retirement benefit পাওয়া যায় (দেখুন প্রাগুক্ত Johnson 1997)। আমেরিকান সমাজে অনেকেই অবশ্য Early retirement এর পক্ষপাতি। কেননা, সেখানে retirement benefit খুবই আকর্ষনীয়।

৯. দেখুন Daniel A. Dorling, *A New Social Atlas of Britain.* New York: John Wiley & Sons (1995).

১০. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন মোঃ ফিরোজ মিয়া, *চাকরির বিধানাবলী.* ঢাকাঃ রোদ্দুর (১৯৯৭) পৃঃ ১০৭।

১১. দেখুন, প্রাগুক্ত মিয়া (১৯৯৭) পৃঃ ১০৯।

১২. দেখুন, প্রাগুক্ত Harris (1988) এবং (1990).

১৩. দেখুন, প্রাগুক্ত মিয়া (১৯৯৭) পৃঃ ১১০।

১৪. দেখুন, The University of Dhaka, *Dhaka University_Order, 1973* (Part 1) Dhaka: Univ. of Dhaka (1990).

১৫. প্রাগুক্ত মিয়া (১৯৯৭) পৃঃ ১১১।

১৬. প্রাগুক্ত University of Dhaka (1990).

১৭. প্রাগুক্ত Ward (1984) পৃঃ ১৪৬।

১৮. প্রাগুক্ত Ward (1984) পৃঃ ১৪৭।

১৯. এ সম্পর্কিত আলোচনা ছাড়াও বয়োবৃদ্ধির তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য দেখুন মুহাম্মাদ হাবিবুর রহমান, "বয়োবৃদ্ধির তত্ত্বঃ একটি সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা"। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, জুন'১৯৯৩।

২০. এ সম্পর্কে অধিক জানতে হলে দেখুন Rasheda Irshad Nasir and Fatema Rezina Pervin. "Aged Male and female: A Sociological Analysis." *Social Science Review,* Vol XIII (1996).

২১. দেখুন, প্রাগুক্ত Harris (1990) পৃঃ ২৭৫।

২২. প্রাগুক্ত Harris (1990).

২৩. প্রাগুক্ত Harris (1990)

২৪. দেখুন, মুহাম্মাদ হাবিবুর রহমান এবং ফাতেমা রেজিনা পারভীন "প্রবীণ জীবনঃ একটি সামাজিক জরিপের প্রতিবেদন" *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা,* অক্টোবর ১৯৯৩-জুন ১৯৯৪।

২৫. প্রাগুক্ত Harris (1990).

২৬. প্রাগুক্ত Harris (1990).

২৭. প্রাগুক্ত Harris (1990).

২৮. দেখুন, Robert Atchley, *The Sociology of Retirement.* New York: Schenkehan (1976).

২৯. প্রাগুক্ত Ward (1984) পৃঃ ১৪৮।

৩০. প্রাগুক্ত Ward (1984).

৩১. দেখুন, প্রাগুক্ত রহমান ও পারভীন (১৯৯৩-১৯৯৪)।

৩২. প্রাগুক্ত, Atchley (1976).

৩৩. প্রাগুক্ত, Harris (1988), p 134.

৩৪. প্রাগুক্ত মিয়া (১৯৯৭), পৃঃ ১০৫।

৩৫. দেখুন, এম.এম আল-ফারুক *পেনশন এন্ড রিটায়ারমেন্ট বেনিফিটসঃ বাংলাদেশ*। ঢাকাঃ আরা পাবলিকেশন (১৯৯১)।

৩৬. প্রাগুক্ত, আল-ফারুক (১৯৯১), পৃঃ ৩।

৩৭. প্রাগুক্ত, আল-ফারুক (১৯৯১)।

৩৮. দেখুন, অধ্যাপক আবুল কালাম আযাদ (সম্পাদিত) *চাকরি, পেনশন, কল্যাণ তহবিল, গ্রুপ ইনসিওরেন্স ও আনুতোষিক বিধিমালা*। ঢাকা খোশরোজ কিতাব মহল (১৯৯৪) পৃঃ ৬।

৩৯. বাংলাদেশে সরকারী এবং স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে (যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) বর্তমানে প্রচলিত পেনশন নির্ধারণের টেবিল (মিয়া ১৯৯৭)।

পেনশনযোগ্য চাকরিকাল	পেনশনের পরিমান (সর্বশেষ প্রাপ্ত বেতনের শতকরা হারে বর্ণিত)
১০ বৎসর	৩২%
১১ বৎসর	৩৫%
১২ বৎসর	৩৮%
১৩ বৎসর	৪২%
১৪ বৎসর	৪৫%
১৫ বৎসর	৪৮%
১৬ বৎসর	৫১%
১৭ বৎসর	৫৪%
১৮ বৎসর	৫৮%
১৯ বৎসর	৬১%
২০ বৎসর	৬৪%
২১ বৎসর	৬৭%
২২ বৎসর	৭০%
২৩ বৎসর	৭৪%
২৪ বৎসর	৭৭%
২৫ বৎসর বা তদুর্ধ	৮০%

৪০. প্রাগুক্ত মিয়া (১৯৯৭)।

৪১. প্রাগুক্ত মিয়া (১৯৯৭) পৃঃ ১০৭।

৪২. দেখুন প্রাগুক্ত আল-ফারুক (১৯৯১) এবং মিয়া (১৯৯৭), পৃঃ ১০৭।

৪৩. প্রাগুক্ত, মিয়া (১৯৯৭), পৃঃ ১০৮।

৪৪. প্রাগুক্ত, আল-ফারুক (১৯৯১), পৃ ১২।

৪৫. প্রাগুক্ত, মিয়া (১৯৯৭), পৃঃ ১০৮-১০৯।

৪৬. প্রাগুক্ত, মিয়া (১৯৯৭), পৃঃ ১১১।

৪৭. প্রাগুক্ত, মিয়া (১৯৯৭)।

৪৮. প্রাগুক্ত, মিয়া (১৯৯৭), পৃঃ ১১৪।

৪৯. প্রাগুক্ত, মিয়া (১৯৯৭)।

৫০. প্রাগুক্ত, মিয়া (১৯৯৭), পৃঃ ১১৪।

৫১. প্রাগুক্ত, মিয়া (১৯৯৭), পৃঃ ১১৫।

৫২. দশ বছর চাকরি না করলে পেনশন পাওয়া যায় না বটে তবে বিশেষ শর্তে ও নিয়মে গ্রাচুইটি পাওয়ার বিধান রয়েছে। পেনশনযোগ্য চাকরিকাল তিন বৎসরের কম হলে কোন প্রকার গ্রাচুইটি বা আনুতোষিক পাওয়া যায় না। তবে চাকরিকাল তিন বৎসরের অধিক এবং পাঁচ বছরের কম হলে তিন মাসের বেতনের সমান এককালীন আনুতোষিক বা গ্রাচুইটি পাবেন। পক্ষান্তরে চাকরিকাল যদি পাঁচ বৎসর বা তার অধিক কিন্তু দশ বৎসরের কম হয়, তাহলে প্রতি পূর্ণ বৎসরের জন্য এক মাসের বেতন হিসেবে সর্বাধিক পনের হাজার টাকা পর্যন্ত এককালীন আনুতোষিক পাবেন (দেখুন প্রাগুক্ত মিয়া (১৯৯৭) ১১৮। এই নিয়মটি সরকারী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে চাকুরেদের জন্য একই ভাবে প্রযোজ্য।

৫৩. প্রাগুক্ত, মিয়া (১৯৯৭)।

৫৪. একটি উদাহরণ দেয়া যাক। একজন ব্যক্তি ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে চাকরি করে অবসরগ্রহণ করলেন। তিনি তাঁর চাকরি জীবনের সর্বশেষ মাসিক মূল বেতন পেয়েছেন ৫,০০০ টাকা। এই ব্যক্তির পেনশন ও গ্রাচুইটি নিম্নোক্তভাবে নির্ধারিত হবেঃ

যেহেতু চাকরিকাল ২৫ বছর বা তদুর্ধ তাই ৮০% হারে ৫,০০০ টাকায় গ্রস পেনশন হবে ৪,০০০ (চারহাজার) টাকা । তিনি গ্রস পেনশনের অর্ধেক সমর্পণ করবেন। ফলে তার মাসিক পেনশন দাড়াবে ৪,০০০ টাকার অর্ধাংশ= ২,০০০টাকা । এর সঙ্গে চিকিৎসা ভাতা ১৫০ টাকা যোগ হবে (মোট ২১৫০ টাকা মাত্র)।

উক্ত ব্যাক্তির গ্রাচুইটি বা আনুতোষিক হবে

২০০০ x ২০০=৪,০০,০০০ (চার লক্ষ টাকা) (যেহেতু চাকরিকাল ২০ বৎসর বা তদুর্ধে তাই প্রতি টাকায় ২০০ টাকা ধরা হয়েছে)।

উক্ত ব্যক্তি যদি বাকী অর্ধেক পেনশন সমর্পণ্ করেন তবে তাঁর গ্রাচুইটির পরিমান হবে

৪,০০,০০০ টাকা

২,০০,০০০ টাকা (২০০০ x ১০০)

৬,০০,০০০ টাকা

(পেনশনের বাকী অর্ধেক সমর্পণ করলে নির্ধারিত বিনিময় হারের অর্ধহারে আনুতোষিক পাবেন। তাই পেনশনের প্রথম অর্ধেকের জন্য যদি চার লক্ষ টাকা পান তবে দ্বিতীয় অর্ধেকের জন্য এর অর্ধেক অর্থাৎ দুই লক্ষ টাকা পাবেন। সে জন্য (১০০ দিয়ে পূরণ করে) দুই লক্ষ টাকা যোগ করা হয়েছে)।

৫৫. বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতি ঢাকা, অফিস থেকে সংগৃহিত আবেদন পত্র তারিখ ২৮-১-১৯৯৭।

৫৬. প্রাগুক্ত, রহমান ও পারভীন (১৯৯৩-৯৪)।

৫৭. এই প্রসঙ্গে জনাব সাজিদুর রহমান রচিত "পেনশন পদ্ধতি এবং অবসরপ্রাপ্ত ও অবসরগ্রহণরত ব্যক্তিবর্গের পেনশন প্রাপ্তিতে সমস্যাদি" শীর্ষক প্রবন্ধটি দেখা যেতে পারে।(অপ্রকাশিত প্রবন্ধ) অপ্রকাশিত প্রবন্ধটি বি.এইচ.ডি.সি, বিসি.এস. (প্রশাসন) একাডেমী এবং বিয়াম কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারের জন্য রচিত।

৫৮. প্রাগুক্ত, Ward (1984).